জানুয়ারি ২০২৪ ■ পৌষ-মাঘ ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

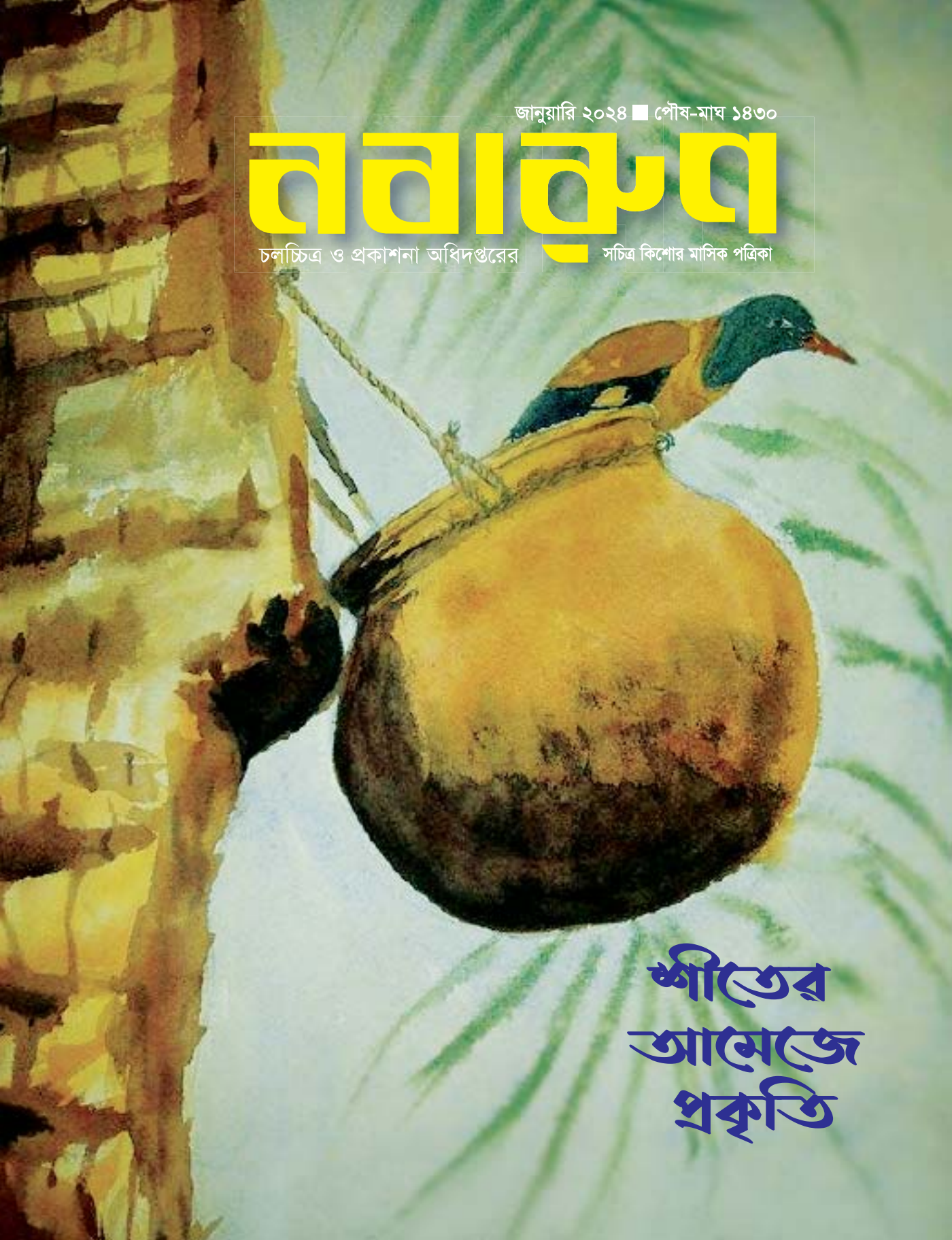

শীতের আমেজে প্রকৃতি

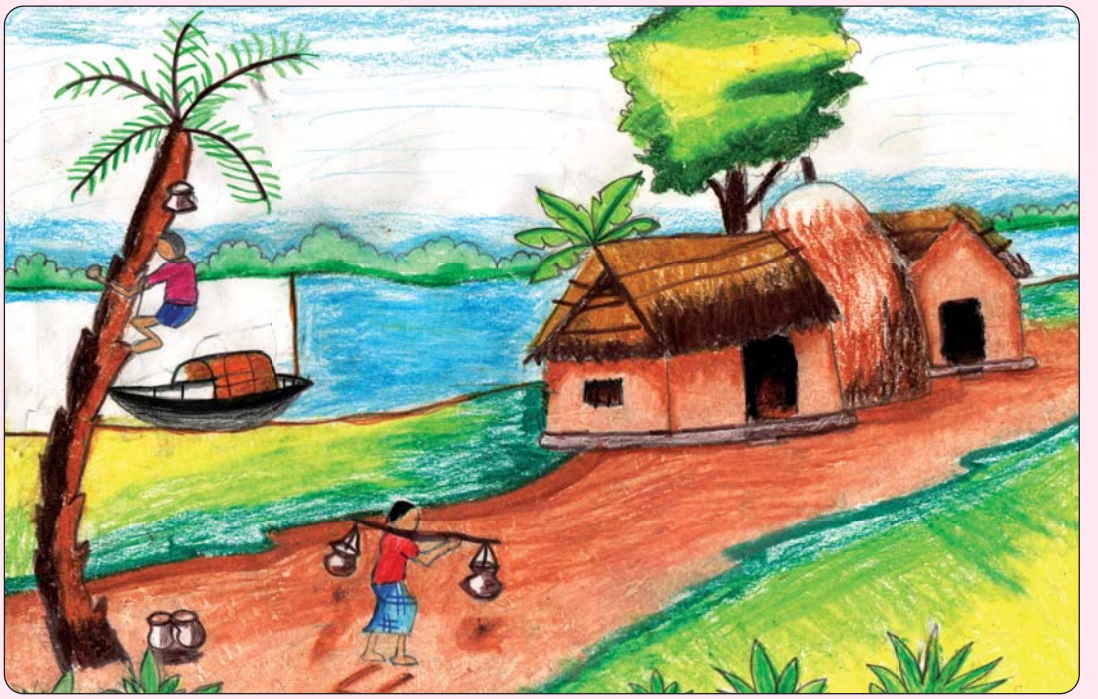

সিরাজুম মুনিরা বিভা, কেজি-১, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

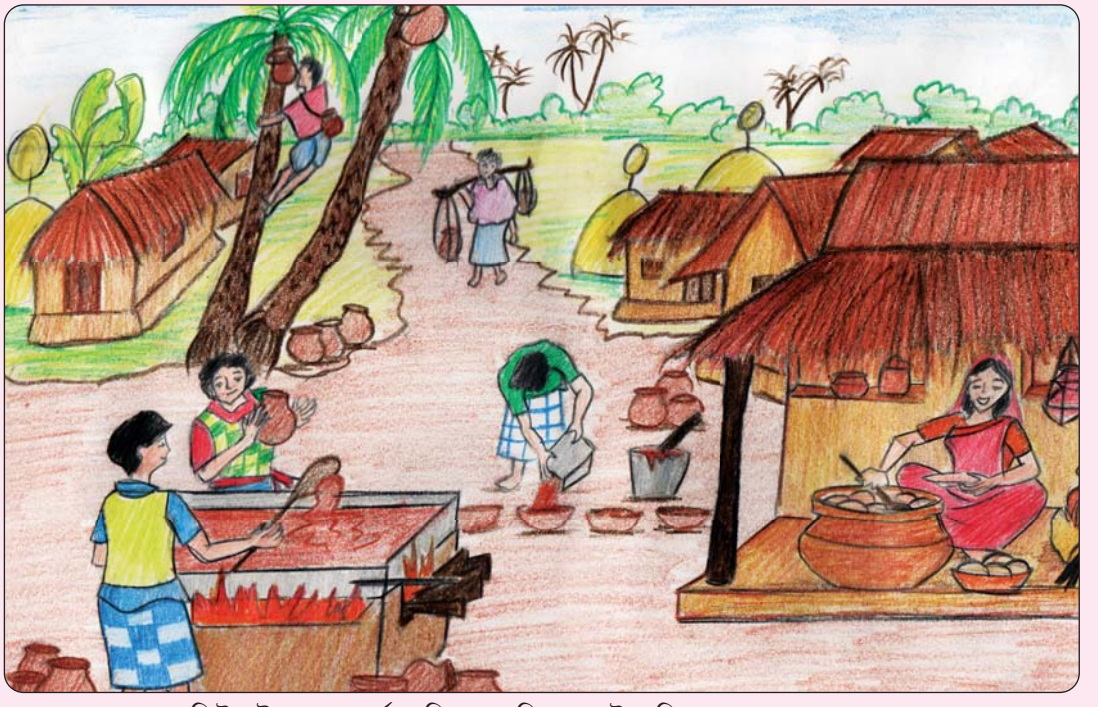

মো. রাফিউল ইসলাম, চতুর্থ শ্রেণি, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বিদায় ২০২৩ সাল। এসে গেল নতুন বছর ২০২৪। তোমাদের সবাইকে জানাই খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন বছরে তোমরা সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো–এই কামনা করছি।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ণতা পায়। তাই ১০ই জানুয়ারি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই দিনটিকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ। আশা করি সংখ্যাটি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যেত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তারপরও থেমে নেই বাংলাদেশ, অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা শামিল।

বিগত বছরের মতো এ বছরও ১লা জানুয়ারি সারা দেশে পালিত হয় 'বই বিতরণ উৎসব-২০২৪'। এদিনে শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বই। নতুন বইয়ের সুঘ্রাণে তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত। নতুন বই, নতুন শ্রেণি এ আনন্দে মেতে উঠে ছোট্ট সোনামণিরা। এ বছর ২ কোটি ১২ লাখ ৫২ হাজার ৬জন শিক্ষার্থীর হাতে ৯ কোটি ৩৮ লাখ ৩ হাজার ৬০৬টি বই তুলে দেওয়া হয়েছে, যা ইতিহাসে বিরল।

নতুন বছরের আগমন মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন ও নতুন শুরু। ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য অফুরন্ত শুভ কামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমি ন সম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৩ সেদিন যদি বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসতেন
মিনার মনসুর
০৯ স্মৃতির ঘুড়ি/ ফরিদুর রেজা সাগর
১২ নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে/ সরকার আবদুল মান্নান
৩৭ শীতের আমেজে প্রকৃতি/মঈনুল হক চৌধুরী
৪৭ খাসিয়া পুঞ্জি/ এস এম মাসুদ
৪৯ যেভাবে পেলাম ইংরেজি বছর ও মাস
কাজী মো. আবু নাছের
৫১ ঐতিহ্যের ঘুড়ি উৎসব/ তৈয়ব হোসেন খান
৫৩ মেঘের ডিজাইনে ঢাকার জার্সি/ রনি হালদার

অনুবাদ লোককথা

৩০ তিন বন্ধু/ শামস্ নূর

গল্প

১৯ আপেল রহস্য/ তারিক মনজুর
২২ ভূতের ভয় আর নয়/ আশরাফ পিন্টু
২৫ ছুটুর হাতে রঙিন বই/ নুরুল ইসলাম বাবুল
৩৩ সাপের হাতি গেলা / মুহাম্মদ বরকত আলী
৪৩ ছুটির গল্প/ আলমগীর কবির
৪৪ টাকি মাছের বুদ্ধি কত / নকুল শর্ম্মা

সাফল্য প্রতিবেদন

৫৪ বর্ণিল স্কুল/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৫ যুব এশিয়া কাপ: চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ/ মেজবাউল হক
৫৬ নিপাহ ভাইরাসে সচেতনতা/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৭ স্মার্ট স্কুল বাস/ শাহানা আফরোজ
৫৮ জাদু দেখিয়ে বিশ্বরেকর্ড/ জান্নাতে রোজী
৫৯ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

ছোটোদের গল্প

৪১ টিকলির দিনলিপি/ সাবাহ্ নূর তৌফিকা
৪৬ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ / ওয়াহিদ মুস্তাফা

ছোটোদের ছড়া

১৭ আরোহা আফরোজ
১৮ মো. সজিব হোসেন/ নওশিনা ইসলাম
৪৫ সামুরাই নিশি/ রাহিমা তাবাসসুম

কবিতাগুচ্ছ

৮ অরণ্যগুপ্ত/ কামরুজ্জামান
১১ আহসানুল হক
১৭ রাজীব হাসান
১৮ জানে আলম মুনশী
২৮ ফরিদ সাইদ/ সালাম ফারুক/ উৎপল দত্ত
মো. শাহীনুর রহমান রিয়াদ
২৯ মাশহুদা মাধবী/ ইমরান পরশ/ ইমরান খান রাজ
৩৬ ডা. হারুন-অর-রশিদ
৪০ মাহ্মূদ বিক্রম/ নীহার মোশারফ
৫২ সোহাগ ফকির

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সিরাজুম মুনিরা বিভা/মো. রাফিউল ইসলাম
তৃতীয় প্রচ্ছদ : নুশরাত জাহান নূর/ দ্বীন মোহাম্মদ
শেষ প্রচ্ছদ : মারিয়া হায়দার দিতু
১৬ ইরাম ইনায়া
৩৯ রাইনা দত্ত
৫০ ইসরাক হাসান আদৃক
৫৮ সাদিদ আল ইসলাম
৬৩ মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ/ সানজিদা আক্তার রুপা
৬৪ মৌমিতা আক্তার বন্যা/ সামিহা হোসেন উম্মি

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*- এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

সেদিন যদি বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসতেন

মিনার মনসুর

তোমরা জানো, বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের এই দেশটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর স্বপ্নের স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। তার আগে, একাত্তরের ২৫শে মার্চের ভয়ংকর সেই গণহত্যার রাতে ঢাকার

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদাররা। তারপর থেকে তিনি কোথায় কী অবস্থায় আছেন কিংবা আদৌ বেঁচে আছেন কি-না সেই খবর পৃথিবীর কেউ জানতো না। পরে আমরা জেনেছি, পাকিস্তানের সেই দুর্গম কারাগারে কবরও খোঁড়া হয়েছিল তাঁর জন্য। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, সেদিন যদি তিনি দেশে ফিরে না আসতেন– যদি পাকিস্তানি বর্বর সেনাশাসকরা বন্দি অবস্থায় তাঁকে হত্যা করত, তাহলে কী হতো নতুন জন্ম নেওয়া এই দেশটির?

যে শিশুটি জন্মলগ্নেই তার পিতাকে হারিয়ে ফেলেছে সে হয়ত নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা কিছুটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু সেদিন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা যা ছিল তাতে তিনি ফিরে না এলে ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশটির পরিণতি কী হতো তা কল্পনা করলেও শিহরিত হতে হয়। দেশের নামিদামি অনেক গবেষক তার কিছুটা বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। আমরা সেদিকে যাব না। কেবল এটুকু বলব, সেদিন আমাদের ঘরে খাবার ছিল না। ছিল না খাবার কিনে খাওয়ার মতো টাকাও। জীবন বাঁচাতে এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসেছিল আরো কয়েক কোটি মানুষ। এদিকে ঘরে-বাইরে তার শত্রুও অনেক। জন্মলগ্নেই তাঁকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল মহাশক্তিধর একাধিক দেশ। তারপরও মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশটি বিশ্বের বুকে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর সেটি সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র মানুষের জাদুকরী নেতৃত্বের ছোঁয়ায়। শুধু তাঁর নামেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বহু দেশ ও মানুষ। কেউ বন্দর মাইনমুক্ত করে দিয়েছে। কেউবা পাঠিয়েছে জাহাজভর্তি খাদ্য ও ওষুধ। দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছো আমরা যাঁর কথা বলছি তিনি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কেন তিনি বঙ্গবন্ধু, কেন তিনি আমাদের জাতির পিতা আর কেনই-বা তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে অভিহিত করা হয়– তাও তোমাদের অজানা নয়। যেটি আমরা জানি না কিংবা জানলেও অনেক সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না সেটি হলো– বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কথাটা বোধ করি একটু কঠিন হয়ে গেল! সহজ কথায়, বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে এবং বঙ্গবন্ধু থেকে বাংলাদেশকে কখনো আলাদা করা যাবে না। কেন যাবে না সেটা বলার আগে আবারও আমাদের ফিরে যেতে হবে একাত্তরের রুদ্ধশ্বাস সেই দিনগুলোতে।

দুই

একাত্তরের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক সেই ভাষণের কথা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। ইতোমধ্যে ভাষণটি শোনার সুযোগও নিশ্চয় হয়েছে। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তখন নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান) তাঁর সামনে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের গর্জনমুখর মন্ত্রমুগ্ধ এক সমুদ্র। আর সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই পুরো জনপদটিই সেদিন পরিণত হয়েছিল এক মহা মানবসমুদ্রে। এমন ঘটনা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। বস্তুত একটি ভাষণই বদলে দিয়েছিল তাদেরকে। আর সে কারণেই ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে মানবজাতির বিশ্ব-ঐতিহ্যের মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে তা রাতারাতি ঘটেনি।

এর জন্য টুঙ্গিপাড়ার অকুতোভয় সেই ছেলেটিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ দুর্গম পথ। তোমরা এতদিনে নিশ্চয় তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি পড়েছ। যদি না পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই পড়ে নেবে। সে সঙ্গে পড়বে তাঁর লেখা আরও দুটি বই–'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন'। এই তিনটি বইতে তাঁর জীবনের ত্যাগ ও সংগ্রামের যেটুকু বিবরণ তিনি লিখে রেখে গেছেন তা-ই তোমাদের কল্পনাকেও হার মানাবে। সব মিলিয়ে মাত্র ৫৫ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এই সামান্য জীবনে একটি মানুষ কী করে এত কষ্ট সহ্য করতে পারেন; কী করেই বা

একটি জাতির ইতিহাসে হাজার বছরে যা সম্ভব হয়নি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন তার খণ্ড খণ্ড চিত্র তোমাদের বিস্ময় বিহ্বল করে রাখবে। আমি নিশ্চিত যে বইগুলো পড়তে পড়তে তোমরাও বদলে যাবে।

জাতির পিতার এত সংক্ষিপ্ত যে-জীবন তার মধ্যে আবার দীর্ঘ ১৪টি বছর কেটেছে কারার অন্ধকারে। সময়ের হিসাবে যা তাঁর মোট আয়ুর চারভাগের একভাগ। এই যে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ তার সবটাই কিন্তু রাজনৈতিক কারণে। তোমরা জেনে অবাক হবে যে তাঁকে সর্বমোট ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করতে হয়েছে। তার মধ্যে ব্রিটিশ শাসনামলে স্কুলের ছাত্র অবস্থায় কারাবন্দি ছিলেন ৭ দিন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিনই কেটেছে পাকিস্তানের কারাগারে। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজেও জীবনবাজি রেখে সংগ্রাম করেছেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে। কেবল বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সব কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

তিন

বরাবরের মতোই একাত্তরের ভয়াল পঁচিশে মার্চেও তিনি সর্বাগ্রে বাজি রেখেছিলেন নিজের জীবন। পাকিস্তানের রক্তপিপাসু ঘাতকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। গোটা মার্চ মাসজুড়ে তারই প্রস্তুতি চলছিল ভেতরে ভেতরে। বঙ্গবন্ধু সবই জানতেন। জানতেন তাঁর সর্বক্ষণের সহকর্মীরাও। সবাই তাঁকে আত্মগোপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকেই আত্মগোপনে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজেই মুখোমুখি হলেন ইতিহাসের বর্বর নরঘাতকদের। পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তিনি জানতেন। জানতেন অন্যরাও। কিন্তু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল– যেমন ছিলেন সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ক্ষেত্রে।

পালাতে হবে কেন? তিনি তো আর বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো নেতা নন। বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছেন। গোপনে কিছু করেননি। যা কিছু করেছেন আইন মেনেই করেছেন। করেছেন তার প্রিয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে। স্বদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের আইনসম্মত এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। এমন কথা জীবনে তিনি বারবার বলেছেন। আর তা যে কেবল কথার কথা ছিল না– ইতিহাসের সেই মহা অগ্নিপরীক্ষার মুখে অবিচল চিত্তে তিনি থেকে গেলেন তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। চারপাশে তখন চলছে পাকিস্তানি ঘাতকদের রক্তের হোলি খেলা। কিন্তু কোনো আকুতি-মিনতিই তাঁকে টলাতে পারল না।

অবশেষে সেই মুহূর্তটি এসে গেল মেশিনগানের মুহর্মুহু আগুনের গোলায় ভর করে। নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালির ভালোবাসার শক্তিই সম্ভবত তাঁকে বাঁচিয়ে দিল এ যাত্রায়। বন্দি হওয়ার আগে ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে তিনি ডাক দেন জাতির বহু প্রতীক্ষিত সেই

এই বিমানে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তাঁর সোনার বাংলায়

স্বাধীনতার— যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নামে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। ইংরেজিতে লেখা সেই ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু বলেন:

এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। (সূত্র: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, সুলভ সংস্করণ ২০২৩, পৃষ্ঠা ২৯৯)

গ্রেফতারের আগে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে প্রদত্ত স্বাধীনতার এই ঘোষণাটি ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

চার

সত্যি সত্যিই সেদিন 'একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবরের' জন্ম হয়েছিল। এক মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে, লক্ষ মুজিব তখন বাংলার ঘরে ঘরে। শারীরিকভাবে তিনি নেই, কিন্তু বাংলার আকাশ-বাতাস সবই তখন মুজিবময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর নামেই জীবনবাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার লক্ষ লক্ষ দামাল ছেলে। এদেশের শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র বাঙালি পৃথিবীর অন্যতম দুর্ধর্ষ সশস্ত্র পাকিস্তানি হানাদারদের বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করেছিল চিরতরে। রক্তসাগরে সেদিন ডুবে গিয়েছিল বাংলার তেরোশত নদ-নদী। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত আর তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা অর্জন করি মহান বিজয়।

আগেই বলেছি, আবার বলি, এমন ঘটনা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। সবই হলো, একটি হাহাকার একটি মহাশূন্যতা কিন্তু থেকেই গেল। কী সেই শূন্যতা কী সেই হাহাকার?

পাঁচ

যার নামে এই স্বাধীনতা, এই বিজয়, এই বাংলাদেশ– তিনি নেই। কোথায় আছেন কেমন আছেন সেই খবরও জানা নেই কারও। এমনকি ধানমন্ডির একটি বাড়িতে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বন্দি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ তাঁর পুরো পরিবারও জানেন না প্রিয় মানুষটির কোনো খোঁজ।

উদ্বেগ তো আর একটা নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। গুদামে খাদ্য নেই। ব্যাংকে টাকা নেই। ক্ষেতগুলো ফসলশূন্য। ঘরে ঘরে স্বজন ও সর্বস্ব হারানো মানুষের হাহাকার। সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ চালাবার মতো কোনো সরকার বা প্রশাসনব্যবস্থাও তখনো চালু হয়নি। প্রবাসী সরকার একটি আছে বটে, কিন্তু কে ধরবে তার হাল? ভেতরে-বাইরে নানা ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় সহযোগী রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা তখনো অস্ত্র হাতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেছে বেছে হত্যা করছে জহির রায়হানের মতো বুদ্ধিজীবী ও মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্টমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের মতো কূটবুদ্ধির মানুষের তখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানের ফাঁসির মঞ্চ থেকে বিজয় উত্তর বাংলাদেশে ত্রাতারূপে আবার ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। বিশ্বজনমতের তীব্র চাপ, সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অতুলনীয় ভালোবাসাই তাঁকে ফিরিয়ে আনে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে।

বস্তুত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজকের

> সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।
>
> -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বদলে যাওয়া যে বাংলাদেশ– তার প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিনই। তারপর পঁচাত্তরের কারবালা সংঘটিত হওয়ার আগে মাত্র সাড়ে তিনবছর তিনি দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর তাতেই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝে গিয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সে কারণেই তারা কাপুরুষোচিত ও নজিরবিহীন নৃশংসতার মধ্য দিয়ে সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল। সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে। মুছে ফেলতে আমাদের বীরোচিত মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় স্মৃতি, চেতনা ও ইতিহাস। তার পরিণতি কী হয়েছে তা তোমাদের অজানা নয়। সেই ষড়যন্ত্রকারীরাই আজ নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। বাংলাদেশকে যে দাবিয়ে রাখা যাবে না তা এখন সারা পৃথিবীই জানে এবং মানে।

তবে সেদিন, ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি, যদি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে গল্পটি হতো ভিন্ন রকম। ❑

কবি ও প্রাবন্ধিক, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

অরণ্যগুপ্ত

জাতির পিতা পাকিস্তানে বন্দি কারাগারে
কি যে নির্মম কাল কাটালেন ভয়াল অন্ধকারে।
অত্যাচারী ইয়াহিয়ার দুঃশাসনের থাবায়-
গণহত্যার বীভৎসতায় বিবেকবানকে ভাবায়।
নারী-শিশু হত্যা করে পাটের কলে আগুন!
অমন সময় কে বলল বাঙালিরা জাগুন

মুক্তিযুদ্ধ- স্বাধীনতার গণহত্যার কালে
বীর বাঙালি হিম্মৎ হাঁকায় ভাঙা নায়ের পালে-
কার ডাকাতে দস্যু- খুনি বর্গিদানব ভাবলো;
মুক্ত-আলো বাতাস কিনতে ঘুমন্তরা জাগালো!
জয় বাংলা বঙ্গবন্ধু- স্লোগানের টানে—
বিজয়েরই বাজলো বাঁশি বীর গেরিলার প্রাণে।

নয় মাসেরই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে-
বিজয়ী জাতি বীর বাঙালি উঠল সবে হেসে।
রাওয়ালপিন্ডির মিওয়ানয়ালী কারাগারে পিতা-
সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে বীর বাঙালির মিতা-
জানুয়ারির দশ তারিখে স্বদেশ ফিরে আসেন
বীরজননী বাংলা মাকে ভীষণ ভালোবাসেন।

বঙ্গবন্ধু যেদিন ফিরে এলেন

কামরুজ্জামান

বঙ্গবন্ধু যেদিন ফিরে এলেন
বাংলাদেশ যেন ফিরে পেল প্রাণ
নেতার জন্য সাত কোটি মানুষ
ছিল অপেক্ষমান।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের শঙ্কিত জনগণ
ফিরে পেলো নতুন প্রাণ
রুক্ষ ফুলেরাও ছড়ায় সুঘ্রাণ
পাখিরাও গেয়ে উঠে স্বাধীনতার গান।

তাঁর ফিরে আসাতে
শোক থেকে জেগে উঠল বাঁচার নতুন স্বপন
তাঁর আগমনে—
স্বাধীনতার সূর্য নতুন করে হয় উদীয়মান।

পিতার জন্য অপেক্ষায় ছিল
বাংলাদেশের সাত কোটি সন্তান
পিতা এসে ঘোচাবেন
চারদিকের শোক, ধ্বংসচিহ্ন আর পোড়াগ্রাম।

শঙ্কিত আকাশ হলো পাখির গানে মুখরিত
ঝরাপাতায় জেগে উঠল বসন্ত।

স্মৃতির ঘুড়ি

ফরিদুর রেজা সাগর

শেষ পর্যন্ত ঘুড়িটা তৈরি হলো। ঘুড়ি মানে পাতলা কাগজে কাঠি লাগানো চারকোনা খেলনা বিশেষ। বরং ঘুড়ি ওড়ানোর সুতা তৈরি করা অনেক কঠিন ব্যাপার। সুতাকে শক্ত করতে হয় নানা উপায়ে। কাচের গুঁড়ো, রং কত কিছুর দরকার হয়। চলতি ভাষায় বলা হয়, সুতায় 'মাঞ্জা' দেওয়া।

ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে সেই সুতোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমি দৃষ্টি দিচ্ছিলাম ভারী কাগজের ওপর। আমার এগারো বছরের ভাগনে পল্টু বারবার বলছিল,

-মামা এত ভারী কাগজ দিয়ে ঘুড়ি উড়বে না কিন্তু।

-উড়বে।

তাহলে সুতো দিয়ে নয় দড়ি লাগবে।

পল্টু পল্টুর মতো চিন্তা করছে। বাজার থেকে খুঁজে খুঁজে সে খাকি রঙের ভারী কাগজ কিনে নিয়ে এসেছে। ঘুড়িটা যখন আকাশে উড়বে তখন এই লাল কাগজটা পতপত করে উড়বে। এটাই পল্টুর ধারণা। একই সঙ্গে পল্টুর চিন্তা, এত ভারী কাগজের ঘুড়ি আকাশে উড়বে কীভাবে?

রাতে ঘুমাতে যাও। সকালে দেখা যাবে ঘুড়ি কীভাবে উড়ছে।

গুগলে দেখেছি কাল ঢাকায় ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা। ঝড়ের মধ্যে তোমার ঘুড়ি ছিঁড়ে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

বোকা ভাগনে আমার। ঝড়ে যাতে ঘুড়িটা না ছেড়ে সেজন্যই তো এত মোটা কাগজ দিয়ে তৈরি করা এই ঘুড়ি।

বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়। চারদিকে ঘন কালো আঁধার। কিন্তু তার মধ্যেও প্লাস্টিকের একটা রেইনকোট পরে হারু মিয়াকে দেখতাম অনেকগুলো লণ্ঠন হাতে পথ দিয়ে হাঁটতেন। আর একেকটি ল্যাম্পপোস্টে একেকটা লণ্ঠন লাগিয়ে যাচ্ছেন। কী সাবধানে হারু মিয়া লণ্ঠনগুলো ঝুলিয়ে দিতেন। লণ্ঠনের আলো বাতাসে কাঁপছিল। কিন্তু নিভে যাচ্ছিল না। ঝড়ের মধ্যেও ছোট্ট গলিটা আলোকিত হয়ে উঠছিল।

অনেক বছর পরে নায়ক রাজ রাজ্জাক তার নিজের প্রতিষ্ঠান রাজলক্ষ্মী প্রডাকশরে লোগো তৈরি করেছিলেন এই রকম একটা ল্যাম্পপোস্ট ও লণ্ঠন দিয়ে। এখন ঢাকা শহরের গলিতে গলিতে এলইডি লাইটের ছড়াছড়ি। তারপরেও জানালার কাচ দিয়ে ভোরবেলা তাকিয়ে থাকি। কখন লাইটগুলো একসাথে নিভে যাবে।

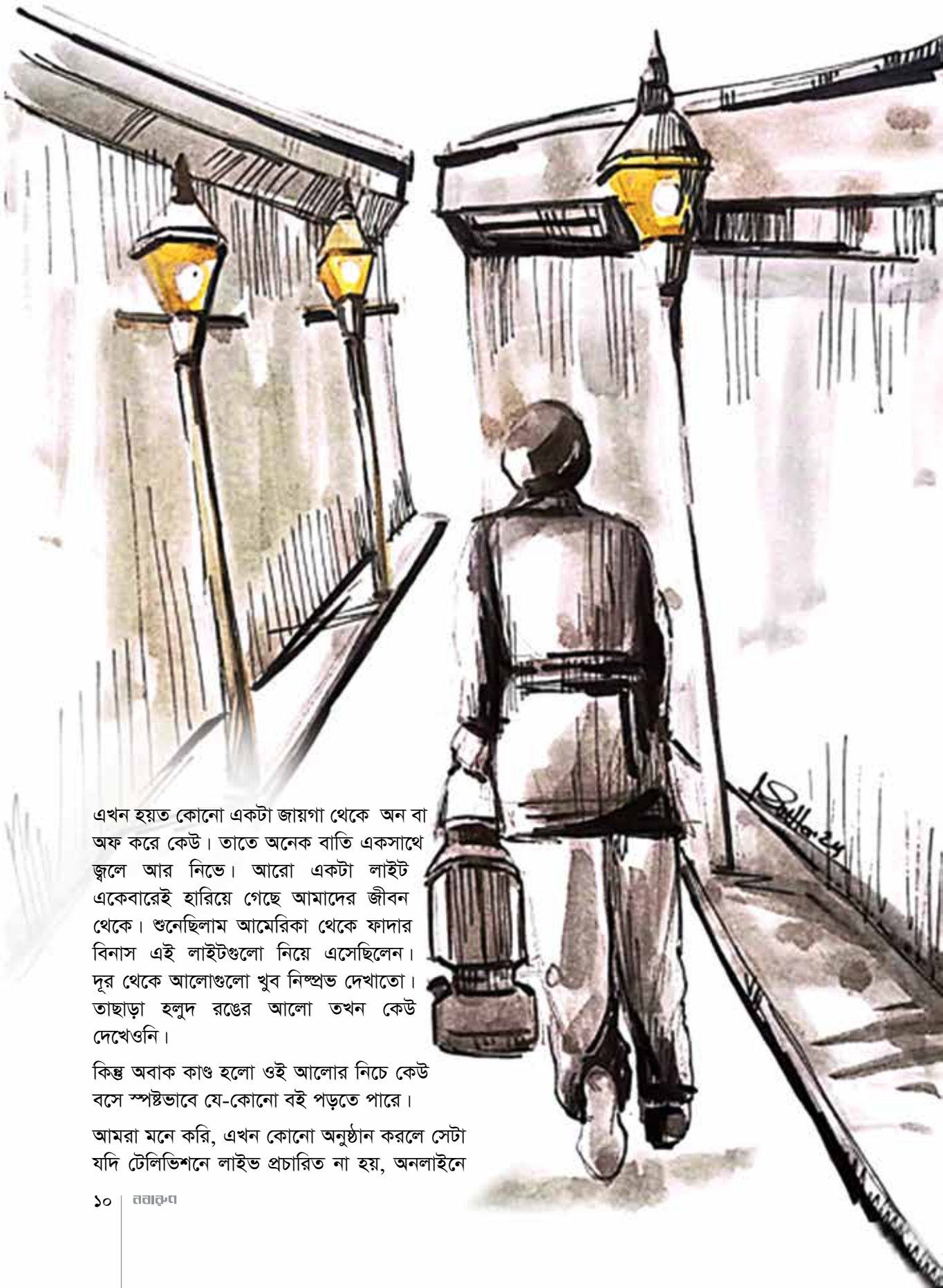

এখন হয়ত কোনো একটা জায়গা থেকে অন বা অফ করে কেউ। তাতে অনেক বাতি একসাথে জ্বলে আর নিভে। আরো একটা লাইট একেবারেই হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। শুনেছিলাম আমেরিকা থেকে ফাদার বিনাস এই লাইটগুলো নিয়ে এসেছিলেন। দূর থেকে আলোগুলো খুব নিষ্প্রভ দেখাতো। তাছাড়া হলুদ রঙের আলো তখন কেউ দেখেওনি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো ওই আলোর নিচে কেউ বসে স্পষ্টভাবে যে-কোনো বই পড়তে পারে।

আমরা মনে করি, এখন কোনো অনুষ্ঠান করলে সেটা যদি টেলিভিশনে লাইভ প্রচারিত না হয়, অনলাইনে

সরাসরি সম্প্রচার না হয়, বেতারে প্রচার না হয়, তাহলে অনুষ্ঠানটির কোনো গুরুত্বই থাকে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর যদি গুরুত্ব থাকে তাহলে বেতার টেলিভিশনের কোনো প্রয়োজনই হয় না। মানুষ এক অদৃশ্য শক্তি দিয়ে সবকিছু জেনে যায়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চাঁদে প্রথম যে মানুষ নেমেছিল তা সবচেয়ে বেশি দর্শক দেখেছিল। সে সময় এলইডি টেলিভিশন ছিল না। এইচডি পর্দা ছিল না। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র চাঁদে মানুষ নামছে সেই দৃশ্য দেখার জন্য ঝাপসা হলেও সারা পৃথিবীর মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর চাঁদে যখন মানুষ নামছিল তখন ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ত তোপখানা মোড়ের এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল টিনের একটা চোঙা দিয়ে। আর গুলিস্তান এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো কাঠের একটা ঘরে বসে থাকা একজন পুলিশের চোখে দেখা আর হাতের সুইচ অন-অফ করায়।

সময়ের ব্যবধানে আজ এই দেশটার অনেক পরিবর্তন। অনেক উন্নতি। নিজের টাকায় আমরা তৈরি করেছি পদ্মা সেতু। বিশাল একটা ব্যাপার। এই সবকিছু সম্ভব হয়েছে একাত্তরের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই ভাষণের প্রভাবে। সেই ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার। স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেই ভাষণ বেতারে, টেলিভিশনে কোথাও প্রচার হতে দেয়নি। অথচ সেই ভাষণ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলাদেশে। সারা পৃথিবীতে। সেই ভাষণ আজও আমাদের চলার পথের বিরাট শক্তি।

সত্যিকার শক্তি সঞ্চয় করতে স্বাধীনতার সুফলকে বড়ো করে তোলার জন্য মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো শক্তি আর কিছু হতে পারে না।

কাল সকালে মোটা কাগজের ঘুড়িটা আকাশে উড়বে কিনা জানি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত আমি পল্টুর হৃদয়ে-মনে সেই অনুভব শক্তি জাগাতে পারব। যা দিয়ে পল্টু আবিষ্কার করতে পারবে আমার অনেক স্মৃতিকে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

নতুন বছর

আহসানুল হক

যাক ঘুচে যাক দুঃখ- জরা
উপচে পড়ুক খুশির ঘড়া
আজকে নতুন বছরে!

যাক থেমে যাক যুদ্ধ-ডঙ্কা
সব অশুভ, সকল শঙ্কা
মাতুক সবাই হর্ষে !

ফুল-ফসলে উঠুক ভরে
আজকে নতুন এই বছরে
যাক ভরে যাক গোলা—

ভালোবাসা, সম্প্রীতি সুখ
লীন হয়ে যাক হিংসা ও দুখ
হোক না হৃদয় খোলা !

বেদন অতীত যাক না ক্ষয়ে
আজকে নতুন সূর্যোদয়ে
যাক না গ্লানি মুছে—

নতুন বছর নতুন আলো
সবার জন্য আনুক ভালো
দিক না আঁধার ঘুচে !

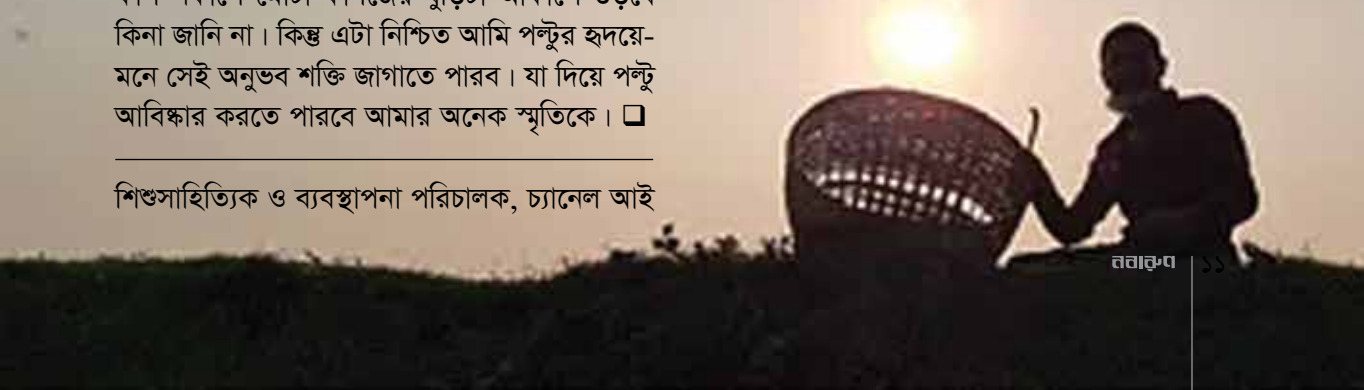

নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে

সরকার আবদুল মান্নান

সত্তরের দশকের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। পরিবারে, স্কুলে কিংবা আমাদের পরিচিত জগতের অন্য কোথাও তখন পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোনো বই ছিল না। আর এই পাঠ্যপুস্তক নিয়েও ছিল অনেক বিড়ম্বনা। বছরের প্রথম দুই থেকে তিন মাস পাঠ্যপুস্তকের হদিস মিলত না।

আমরা অনেকেই তখন বড়ো ভাইবোনদের, আত্মীয়-স্বজনদের বা পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়ত, তাদের পুরনো বই সংগ্রহ করার চেষ্টায় থাকতাম। আগে থেকেই আমরা কাউকে না কাউকে বলে রাখতাম। কিন্তু এ ধরনের সুবিধা সবার জন্য এবং সব সময় থাকত না। সুতরাং অনিবার্যভাবেই আমাদের প্রায় সবারই নির্ভর করতে হতো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ের উপর। বোর্ড কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তকগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে তিন থেকে চার মাস সময় নিত। দেখা যেত, বছরের প্রথম দিকে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসের দিকে দুই-তিনটি বই পাওয়া গেছে। আরো এক-দুই মাস পরে বাকি বইগুলো পাওয়া যেত। এই বইগুলো কখনো কখনো পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানো হতো। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারে বইয়ের দোকান থেকে বইগুলো কেনা যেত। ওই দোকানিদের কাছে পাঠ্যপুস্তকগুলো কীভাবে পৌঁছাতো সেই ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। আমরা শুধু এটুকুই জানতাম যে- বাবা, চাচা, বড়ো ভাই বা এরকম কোনো নিকটাত্মীয় আমাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকগুলো কিনে নিয়ে আসত। ফলে সেই সময় শিক্ষকগণ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতেন তাদের হাতে থাকা পুরনো পাঠ্যপুস্তক দিয়ে। এতে যে স্কুল পরিচালনায় তেমন কোনো সমস্যা হয়েছে তা নয়।

তবে শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানোর ফলে তাদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যাহত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা বছরান্তে সিলেবাস সমাপ্ত করতে পারত না। আর ক্লাসে প্রায় প্রতিদিনই শোনা যেত শিক্ষার্থীরা বই পায়নি– এই বই পায়নি, সেই বই পায়নি। সুতরাং পড়ে আসতে পারেনি, বাড়ির কাজ করে আসতে পারিনি ইত্যাদি। ক্লাসেও শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমস্যা হতো। এরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো আমাদের প্রায় সবাইকে।

আমাদের সেই সময় আজকের মতো বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমরা অনেকেই কোনো একটি বই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের বিনোদন অনুভব করতাম এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে বইগুলো পড়ে শেষ করে ফেলতাম। বিশেষ করে বাংলা বইটি ছিল আমাদের প্রায় সবারই খুব প্রিয়। ওই বইটিতে যতগুলো গল্প, কবিতা কিংবা নিবন্ধ থাকত, সেগুলো আমরা কিছু দিনের মধ্যেই পড়ে ফেলতাম। অন্য বইগুলো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পাতা উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতাম। প্রতিটি বইয়ের মধ্যেই সাদাকালো ছবি থাকত। ওই ছবিগুলোর প্রতি আমাদের ছিল দুর্বার আকর্ষণ। কিন্তু অধিকাংশ বই আমাদের নাগালে পৌঁছুতে পৌছুতে প্রায় তিন থেকে চার মাস সময় লেগে যেত।

তখন আমরা বুঝতাম না যে, পাঠ্যপুস্তকগুলোর আসল উদ্দেশ্য কী। পাঠ্যপুস্তক পড়ে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর শিখে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে– এই ছিল আমাদের ভাবনা। কিন্তু এখন জানি যে, এর চেয়ে অনেক বড়ো উদ্দেশ্য আছে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের আগে প্রণিত হয় শিক্ষাক্রম। ওই শিক্ষাক্রমে লেখা থাকে যে, শিক্ষার্থীদের কেমন মানুষ হিসেবে দেখতে চায় জাতি। তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া দরকার। দেশের ও বহির্বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কেমন শিক্ষা প্রয়োজন, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে শিক্ষাক্রমে। আর সেই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের আলোকে রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক হলো শিক্ষাক্রমের বাহন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তক কতটা গুরুত্বপূর্ণ শিখন-শেখানো উপকরণ।

২০১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ নিয়ে নানারকম অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা ছিল। সে সময় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপিত হয়। মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যপুস্তক পাইকারি বিক্রি করতে গিয়ে বেশি মুনাফার আশায় কৃত্রিম সংকট তৈরি করত। আর বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের চড়া দামে এবং কখনো কখনো পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নোট-গাইট কিনতে বাধ্য করত। ফলে এই সংকট আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সংকট শহর থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এতে সারা দেশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যাহত হতে থাকে। বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকের সংকটের জন্য শিক্ষার্থীরা মারাত্মক অসুবিধায় পড়ে। বইয়ের অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা চিরতরে শেষ হয়ে যেত। এছাড়া কারো পাঠ্যপুস্তক আছে এবং কারো নেই, কারো পাঠ্যপুস্তক নতুন, কারো পুরনো– এ ধরনের বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন বইয়ের মিষ্টি গন্ধের আস্বাদ নেওয়ার সুযোগ হতো না সবার। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে মুক্তি লাভ করা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এমন পরিস্থিতিতে ২০১০ সালে তৎকালীন সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্তটি ছিল, বছরের প্রথম দিনে স্কুলের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হবে।

প্রথম দিকে সরকারের এই মহৎ কার্যক্রমটিকে ব্যাহত করার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তেজগাঁওয়ে অবস্থিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গোডাউনে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো বিধ্বংসী কাজও সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারকে

কিছুতেই এই মহৎ উদ্যোগ থেকে সরাতে পারেনি ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই থেকে আজ ২০২৪-এর শুরু পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর ধরে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে শুরু করে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে আসছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নতুন ক্লাসে উঠে কোনো শিক্ষার্থী যেন পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে না যায়; দ্বিতীয়ত বছরের প্রথম থেকে শেষাবধি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের, এমনকি অভিভাবকদের যেন কোনো রকমের ঝামেলার মধ্যে পড়তে না হয়, হয়রানির মধ্যে পড়তে না হয় কিংবা প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করতে না হয়। এইসব বিবেচনায় রেখে প্রতি বছর সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার পাঠপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিপুল সংখ্যার এরকম পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কোনো নজির নেই। বিষয়টি *গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড*-এ স্থান পেতে পারে। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সরকারের বিনামূল্যে কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে লাভটা কোথায়? এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের বহুবার শুনতে হয়েছে। এর পরিষ্কার উত্তর হলো, যে শিশু-কিশোররা এক সময় জাতির হাল ধরবে, যাদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এক সময় জাতিকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেবে, তারা যদি উপকৃত হয় তাহলে সেই উপকার তো সরকারেরই। এছাড়া শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি হয় পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিখনফলের আলোকে। পাঠ্যপুস্তকের শংকট থাকলে শিখন-শেখানো এই কার্যক্রম ব্যাহত হয়। স্বশিখনের যে পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে প্রচলিত, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তা সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষার্থী বই পড়ে নিজেই অনেক কিছু শিখতে পারে। এছাড়া নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক যে সব ছবি, গ্রাফ, মানচিত্র, সারণি থাকে সেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৃশ্যগ্রাহ্য বোধ তৈরি করে যা তাদের জ্ঞানার্জনকে সহজ করে তোলে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই দৃশ্যগ্রাহ্য অনুভব তৈরি করা যায় না।

এই পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নকে বা প্রণয়নকে কেন্দ্র করে আরো একটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

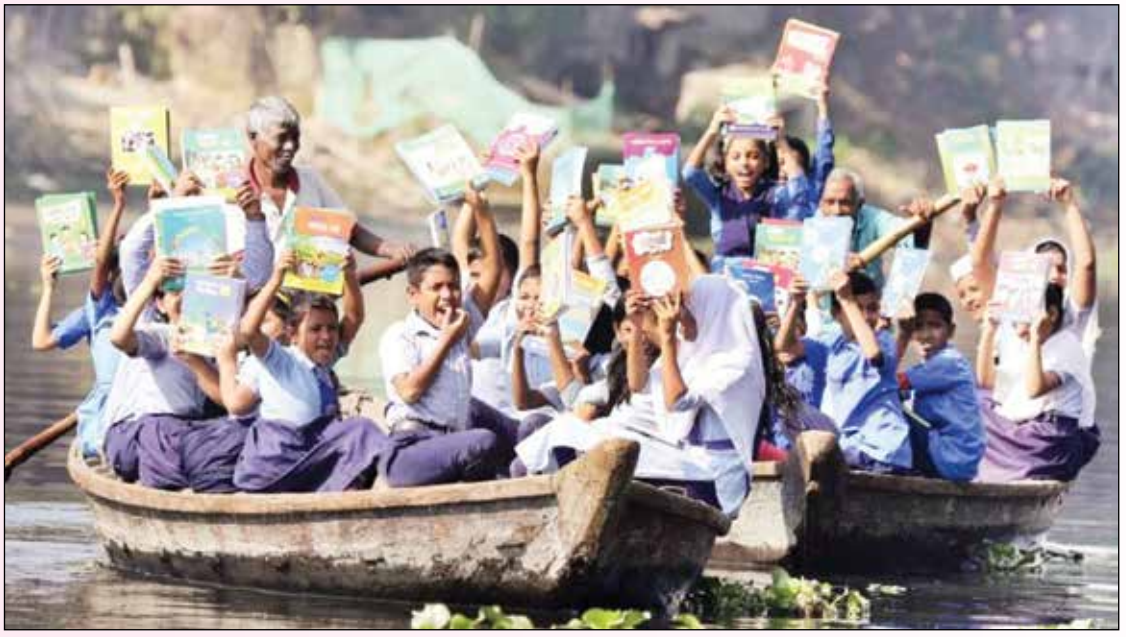

বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে বাংলাদেশেই প্রথম বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যেন তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে পারে, এই হলো উদ্দেশ্য। এতে শিশুদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক ক্ষমতায়ন তৈরি হয়। ২০১০ সাল থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের মাতৃভাষাকে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য ওই ব্যবস্থাটি ছিল যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মাতৃভাষার অবমাননা নিয়ে কিংবা কোনো কোনো ভাষার বিলুপ্তি নিয়ে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশের সরকার তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলাদেশে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এখন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঁচটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু ২০১০ সালে সম্ভাবনার যে দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই দুয়ার দিয়ে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অসংখ্য শিশু প্রবেশ করতে পেরেছে, তার প্রমাণ নেওয়ার জন্য দক্ষিণ কিংবা পাহাড়ি উত্তরাংশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বোঝা যাবে কতটা এগিয়েছে তারা।

অন্য একটি বিষয় হলো, আমরা সাধারণত যাকে পাঠ্যপুস্তক বলি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী একজন মানুষের কাছে সেটা স্রেফ সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাদেরও তো পড়াশোনা করার অধিকার আছে। সংবিধান তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। সুতরাং সেই ২০১০-১১ সালেই প্রশ্ন উঠে যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? আর তারই প্রেক্ষিতে প্রণিত হয় ব্রেইল বই। এবং তার জন্য এগিয়ে আসে ব্রেইল গ্রন্থ প্রণয়নে দক্ষ ব্যক্তিবর্গ। শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝেও ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ওই যাত্রা এখনো সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত আছে।

প্রশ্ন উঠে বছরের প্রথম দিন সকল শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার কী প্রয়োজন আছে? বছরের প্রথম দিন থেকেই তো আর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় না। বছরের প্রথম দিন থেকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুরু হলো কি হলো না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিষয় হলো একটি সংস্কৃতি তৈরি করা। এখন বছরের প্রথম দিনটি দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই দিনে এখন যে শুধু বই বিতরণ করা হয় তা নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজনের ভেতর দিয়ে এখন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস পালন করা হয়। প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, পোস্টার, ব্যানার, রঙিন বেলুন ইত্যাদি নিয়ে র‍্যালির মাধ্যমে শুরু হওয়া পাঠ্যপুস্তক উৎসব এখন সত্যিকার অর্থেই আনুষ্ঠানিকতা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বছরের প্রথম দিনটিকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি শুভ উদ্‌বোধন ও শুভযাত্রা হিসেবে গ্রহণ করছে। অভিভাবকগণ এই দিনটিকে তার পোষ্যদের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সবার মধ্যেই আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। ফলে ঝরে পড়ার হার অনেক কমেছে। সবকিছুরই শুভযাত্রার একটি কল্যাণকর ও মঙ্গলিক দিক রয়েছে। আমাদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জগতে জানুয়ারির প্রথম দিনটি এখন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস হিসেবে একটি কল্যাণকর যাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফলে আজকের প্রজন্মের কাছে, শিশু-কিশোরদের কাছে এই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। একেবারে গ্রামেগঞ্জে, শহরে-নগরে, হাওর-বাঁওরে ও পাহাড়ি অঞ্চলে সর্বত্রই ওই দিনটিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়, তাকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে আলাদা হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ফলে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস একটি জাতীয় উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে কেন্দ্র করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, তার বিস্তার

ক্রমে অন্যদিকেও ঘটতে শুরু করেছে; আর তা হলো গ্রন্থমেলার প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বাংলা একাডেমির একুশের বইমেলায় শুধু নয়, উপজেলায়, জেলায় এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে এমনকি কোথাও কোথাও স্কুল-কলেজের ক্যাম্পাসে নানা সংগঠন সংস্থা ও ব্যক্তির আয়োজনে গ্রন্থমেলা হচ্ছে। ওই গ্রন্থমেলাগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। মোবাইল নির্ভরতার সংস্কৃতি নিয়ে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্ততার অভিযোগ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা চলছে; তার বাইরে যে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা গ্রন্থের প্রতিও আগ্রহী হয়ে উঠছে; গ্রন্থমেলার প্রতি তাদের কৌতূহল, উৎসাহ, উদ্দীপনা বাড়ছে; এই বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। পাঠ্যপুস্তক উৎসবের ভেতর দিয়ে গ্রন্থসংশ্লিষ্ট উৎসব ও মেলার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের সূচনালগ্নেই স্লোগানের প্রচলন ছিল। প্রথম স্লোগান ছিল কবি কামাল চৌধুরীর লেখা একটি কবিতার অংশবিশেষ। স্লোগানটি ছিল এ রকম, 'নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে/ ফুলের মতো ফুটবো/বর্ণমালার গরব নিয়ে/ আকাশ জুড়ে উঠবো।' সে বছর নতুন বই হাতে নিয়ে শিশু-কিশোরদের আনন্দ-উল্লাস ছিল কবি কামাল চৌধুরীর এই পঙ্‌ক্তির মতোই। এবারও বছরের প্রথমদিন সকল শিক্ষার্থীর হাতে সরকার তুলে দিয়েছে নতুন বই। বরাবরের মতো এ বছরও নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখে-মুখে ছিল নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি। শীতের পরশমাখা স্নিগ্ধ সকালে হাতে পাওয়া নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে শিশু-কিশোররা যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ছিল। পাঠ্যপুস্তক উৎসবের এই দৃশ্য এখন দেশময় সুপরিচিত। এখন তার সঙ্গে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের যে জগৎ নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে পরবর্তী বছরগুলোতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব অধিকতর বৈত্রিপূর্ণ ও প্রাণময় হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। ❑

গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক, অধ্যাপক
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইরাম ইনায়া, চতুর্থ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ছড়া

আরোহা আফরোজ

হচ্ছে না যে পড়া,
আপুমণি বলেছে আমায়
লিখতে হবে ছড়া।
নইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে
রেগে যাবেন চড়া।

গণিত, ধর্ম রইল বাকি,
মা তো বলবে, দেই যে ফাঁকি।
ছড়া কি ভাই এমন জিনিস
ইচ্ছে মতোন গড়া?
লিখতে হবে ছড়া–

লিখতে কঠিন লাগে কিন্তু
পড়তে লাগে ভালো
ছড়া যেন চন্দ্র, সূর্য
দিনের বেলার আলো।

গরমকালে ছড়া মানে
একটু বৃষ্টি পড়া,
শীতের দিনে, ছড়াই আনে
রোদের আলো কড়া।
লিখব কি ভাই ছড়া?

চতুর্থ শ্রেণি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

নতুন বইয়ের খুশি

রাজীব হাসান

নতুন নতুন বই এসেছে
শিক্ষার্থীদের জন্যে
নতুন বছর বই পেতে যে
ছুটছে হয়ে হন্যে।

যতন করে শিশু-কিশোর
চাপিয়ে বুকে বই
এদিক-ওদিক ছুটছে সবে
করে হই-হুল্লোড় হই।

বইয়ের ভেতর কী কী আছে
দেখায় মা-বাবাকে
উঠান থেকে শিশু-কিশোর
চিৎকার করে হাঁকে।

নতুন বইয়ের মোড়ক তুলে
দেখ চেয়ে দেখ সবে
লেখাপড়া শিখে আমায়
মানুষ হতেই হবে।

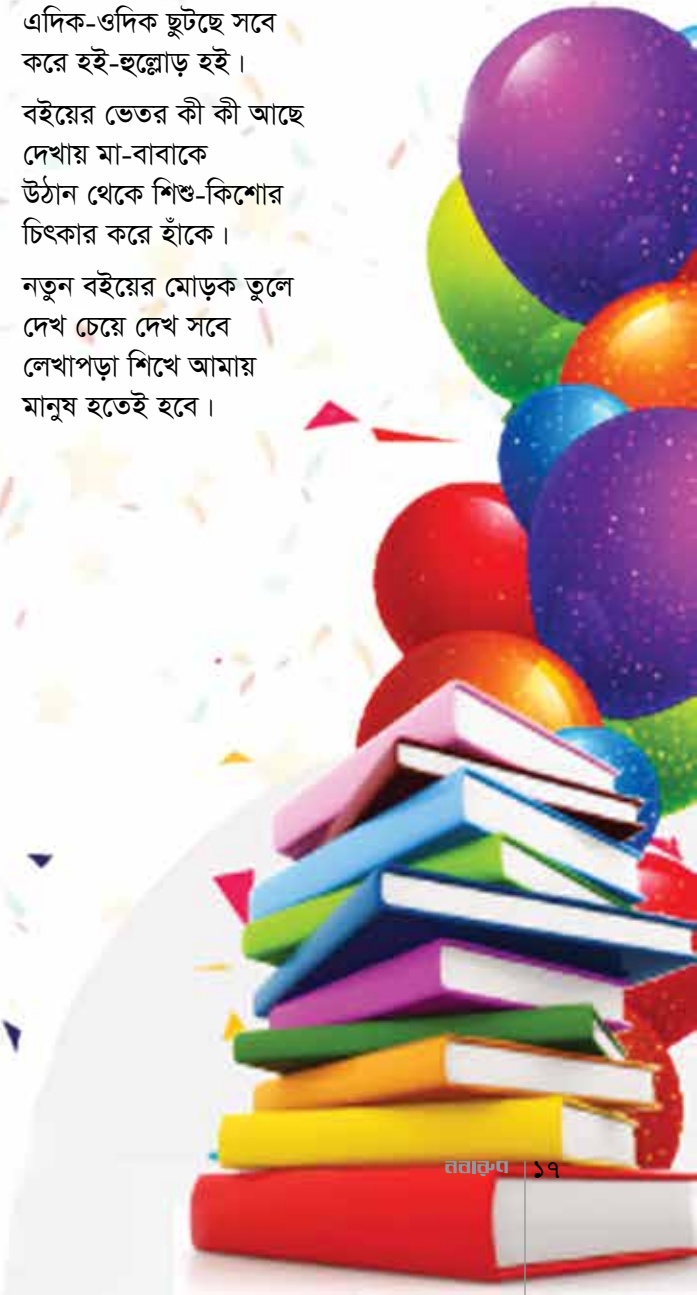

নতুন বই

মো. সজিব হোসেন

নতুন বই হাতে পেয়ে
খুশি খুকুর মন
মজার সব ছড়াগুলো
পড়ছে সারাক্ষণ।

নতুন ক্লাসের সাথে পেল
নতুন কিছু সখা
হই-হুল্লোড়ে মেতে উঠে
পেয়ে তাদের দেখা।

নবম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মান্ডা, ঢাকা

নতুন বই

নওশিনা ইসলাম

বছরের শুরুতে বই উৎসব,
স্কুলে তাই নিয়ে বাড়ে কলরব।
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ খুব ভালো লাগে,
আনন্দে ছুটে যাই সবার আগে।

বই পেয়ে হাতে, যখন আসি বাড়ি,
বিড়াল ও পুতুলের সাথে দেই আড়ি।
বাবা ডাকে মা ডাকে নাই তাতে মন,
কী আছে নতুন বইয়ে দেখি সারাক্ষণ।

নতুন ক্লাস আর নব নব বই,
তাই নিয়ে আমরা করি হইচই।

একাদশ শ্রেণি, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা

ফুল-পাখিদের মেলা

জানে আলম মুনশী

নতুন বছর নতুন পড়া
নতুন নতুন ছন্দে।
খোকা-খুকির মন ভরে যায়
নতুন বইয়ের গন্ধে।

শিশু-কিশোর স্কুলে যায়
আলোর ছড়াছড়ি,
সবার মনে কি আনন্দ
আহা! মরি মরি।

প্রতিদিনই পূর্বাকাশে
নতুন সূর্য উঠে,
প্রতিদিনই ফুলবাগানে
নতুন ফুল ফোটে।

শিশু-কিশোর মিষ্টি রোদে
খেলছে নতুন খেলা,
বছর জুড়ে পাঠশালাতে
ফুল-পাখিদের মেলা।

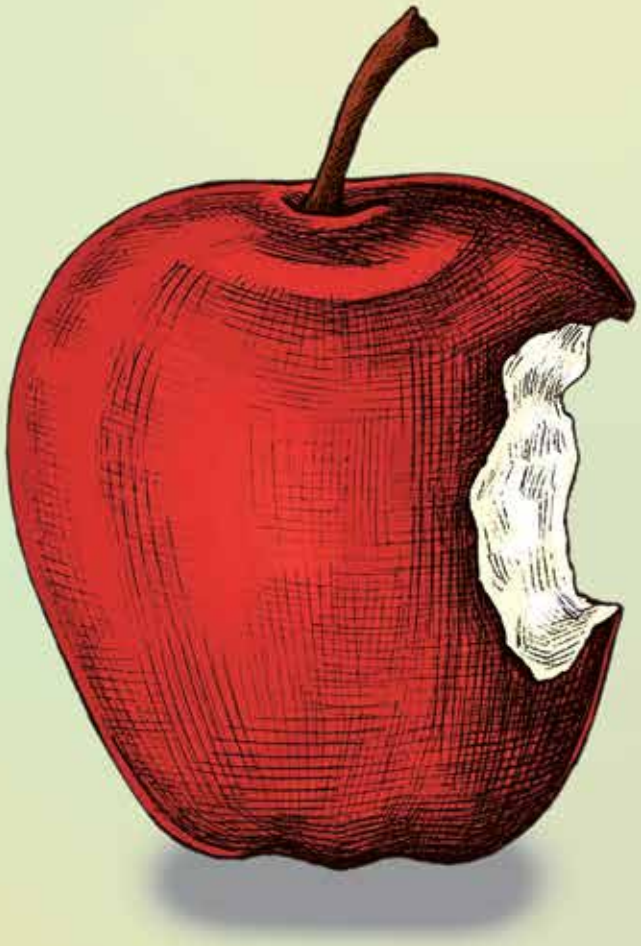

আপেল রহস্য

তারিক মনজুর

বিটু আপেলটা ডাইনিং টেবিলে রেখে হাতমুখ ধুতে গিয়েছিল। এসে দেখে আপেলটায় কে যেন একটা কামড় বসিয়েছে। আস্ত আপেল। একদিকে খাওয়া। কিন্তু ওকে না বলে আপেলটায় কামড় বসালো কে?

বিটু রান্নাঘরে মায়ের কাছে গেল। মা বললেন, 'এখন বিরক্ত করো না তো, বিটু! রান্না করছি।'

রান্না করার সময় মা রান্নাঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না। ঢুকলেও তাড়াতাড়ি বের করে দেন। ওই সময় তিনি বেশ অস্থির থাকেন। রান্না শেষ হলে আবার সব ঠিক।

বিটু রান্নাঘর থেকে আবার ডাইনিং টেবিলের কাছে এল। আপেলটা এখনো সেখানেই আছে। একদিকে খাওয়া। দাঁতের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিটু ভাবার চেষ্টা করল কে খেতে পারে।

এই বাড়িতে ওরা পাঁচজন থাকে। মা, বাবা, আলুনি খালা, তিসি আপা আর বিটু। তার মানে সন্দেহের তালিকায় থাকে চারজন। এর মধ্যে মাকে বাদ দেওয়া যায়। কারণ, তিনি রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। রান্না শেষ না করে মা ডাইনিং টেবিলের দিকে আসবেন না। আসলেও ফট করে একটা জিনিস তুলে খাবেন না। কামড় দেওয়ার আগে অন্তত ভাববেন, আপেলটা কার? কে এখানে রেখেছে?

এরপর থাকে বাবা। বাবা আজ অফিসে যাননি। তিনি তার ঘরে বসে ল্যাপটপে মিটিং করছেন। সপ্তাহের দু-একটা দিন অফিসে যান না। ল্যাপটপে বসে অফিসের লোকজনের সাথে মিটিং করেন। তখন তার কাছে যাওয়া যায় না। তিনিও তার রুম থেকে বের হন না। অতএব বোঝা যাচ্ছে, বাবা আপেলে কামড় বসাননি। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিটু বাবার ঘরে উঁকি দিলো।

হ্যাঁ, বাবা মিটিং করছেন। বিটু যে উঁকি দিয়ে তাঁকে দেখছে, সেটা তিনি খেয়ালই করলেন না।

বিটু আবার ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে বসল। এ কী কাণ্ড! একটা পিঁপড়া চলে এসেছে তার আপেলের কাছে। আপেলটার চারদিকে ঘুরছে। কীভাবে আপেলে উঠবে ঠিক করতে পারছে না। বিটু চাইলেই আঙুল দিয়ে সেটাকে আপেলের উপরে তুলে দিতে পারে। কিন্তু বাবা বলেন, সবাইকে নিজের মতো চলতে শিখতে হয়। নইলে পৃথিবীতে টিকে থাকা কঠিন। বিটু তাই চুপ করে দেখতে লাগল, পিঁপড়াটা কী করে।

এমন সময় তিসি আপা ডাইনিং টেবিলের কাছে এল। তিসি আপা এবার কলেজে উঠেছে। আর বিটু মাত্র ক্লাস ফোরে পড়ে। তাই বিটুকে বেশি পাত্তা দিতে চায় না সে। দরকার হলে বিটুকে দিয়ে একটু-আধটু খাটিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে চকলেট-টকলেট দেয়। ওই পর্যন্তই। সারাক্ষণ সে বই নিয়ে পড়ে থাকে। কলেজের নাকি অনেক পড়া। এক সেকেন্ডও নষ্ট করার সময় নেই।

তিসি আপা জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক ঢক করে খেলো। তারপর গ্লাসটা ধাম করে টেবিলের উপর রাখল। গ্লাস রাখার শব্দে বিটু একটু চমকে ওঠে। তিসি আপা কোনো কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। তারপর কী মনে করে পিছন ফিরে বিটুর দিকে তাকালো। বলল, 'কী রে বিটু! আপেল নিয়ে গবেষণা করছিস যে! এক কামড় খেয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিস কেন? না খেলে আমার ঘরে দিয়ে যা।'

বিটু কিছু একটা উত্তর দিতে যাবে, তার আগেই আপা তার ঘরে ঢুকে পড়ল।

পরীক্ষা থাকলে তিসি আপা আপেল খায়। বলে, আপেল খেলে ঘুম কমে। এখন আপার কলেজে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু তাই বলে বিটুর আপেলে এক কামড় বসিয়ে চলে যাওয়ার কথা না। তাছাড়া সে খায়নি বোঝাই যাচ্ছে। কারণ, খেলে বলত না 'কী রে! এক কামড় খেয়ে বসে আছিস যে!'

বিটু আপেলটার দিকে আবার তাকালো। কামড়ের অংশটা এতক্ষণ সাদা ছিল। এখন একটু বাদামি হয়ে গেছে। এটা কেন হয় ইন্টারনেটে খুঁজে দেখতে হবে। ইন্টারনেটে সব তথ্য পাওয়া যায়। আপেল কেটে রেখে দিলে বাদামি হওয়ার কারণও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। হঠাৎ বিটুর মনে হয়, আপেল তো আছে। পিঁপড়াটা গেল কোথায়? একটু আগেও তো টেবিলের উপরে ছিল। এখন কি তবে আপেলের

উপরে উঠে গেছে? নাহ্, আপেলের উপরেও ওটাকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কোথায় গেল ওটা?

কিছুদিন আগে ইন্টারনেটে একটা মজার তথ্য পেয়েছে বিটু। পিঁপড়াদের নাকি কান নেই। ওরা নাকি পা আর হাঁটু দিয়ে শোনে! বিটুর এই তথ্য শুনে তিসি আপা বিশ্বাস করেনি। সে বলেছে, 'ধুর! যত সব ফালতু কথা।' কিন্তু এটাই সত্যি। বাবা শুনে বলেছেন, 'পিঁপড়াদের শোনার পদ্ধতি একটু অন্যরকম। তারা পা আর হাঁটু দিয়ে মাটির কম্পন বোঝার চেষ্টা করে। সেই কম্পন বুঝে তারা চলে। যে কারণে ভূমিকম্প, বন্যা কিংবা বড়ো কোনো দুর্যোগ হলে পিঁপড়া সবার আগে টের পায়।'

আচ্ছা, পিঁপড়াটা টেবিলের উপরে নেই, আপেলের উপরে নেই। তার মানে এখান থেকে সে পালিয়েছে। কিন্তু পালাবে কেন? তখনই মনে হলো, পালাবেই তো। তিসি আপা যে জোরে গ্লাসটা টেবিলে রেখেছে! সেই কম্পন নিশ্চয়ই পিঁপড়াটাকে বাধ্য করেছে এখান থেকে চলে যেতে। বিটু আবার আপেল নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আপেলে কামড় তাহলে কে দিতে পারে? আলুনি খালা? আলুনি খালা অবশ্য কখনো অন্যের খাবারে এভাবে হাত দেয় না। তবু বিটু চেয়ার থেকে উঠে আলুনি খালার খোঁজে গেল।

আলুনি খালা তখন একটা মইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ফলস ছাদের ময়লা পরিষ্কার করছে। বিটুকে দেখেই হেই হেই করে উঠল। বলল, 'এহান থিকা সরো, বিটু সোনা! মাথার উপরে ময়লা পড়ব।'

বিটু দেরি না করে সেখান থেকে সরে এল। নাহ্, আলুনি খালা আপেলে কামড় বসায়নি। সে ফলস ছাদের ময়লা পরিষ্কার নিয়ে মহাব্যস্ত। তাহলে, কে এমন কাজ করতে পারে? বিটুদের উপরের ফ্ল্যাটে বাড়িঅলা চাচা থাকেন। তার একটা চার-পাঁচ বছরের নাতি আছে। খুব দুরন্ত। সুযোগ পেলেই সে বিটুদের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। খাওয়ার কিছু দেখলে কাউকে কিছু না বলে মুখে দেয়। মা অবশ্য রাগ করেন না। বলেন, 'ছোটো বাচ্চা। একটু দুষ্টুমি তো করবেই।' কিন্তু বিটুর রাগ হয়। ছোটো বাচ্চা হলেই যে-কোনো জিনিস মুখে দিতে হবে? বিটুর বয়স যখন চার-পাঁচ ছিল, তখন সে তো কিছু মুখে দেয়নি!

বিটু সিদ্ধান্ত নেয়, এক কামড় আপেল খাওয়ার কাজটা বাড়িঅলার নাতি করেছে। বিটু ঘটনাগুলোকে এভাবে সাজায়- সে স্কুল থেকে এসে ব্যাগটা নিজের ঘরে রেখেছে। তারপর ব্যাগ থেকে আপেলটা বের করে ডাইনিং টেবিলে রেখেছে। এরপর হাতমুখ ধোয়ার জন্য ঢুকেছে বাথরুমে। আর ওই সময়েই বাড়িঅলার নাতি এসে আপেলটায় কামড় বসিয়েছে।

টিফিনের সময়ে আপেলটা খেয়ে ফেললে এই রহস্য তৈরি হতো না। কিন্তু আপেলটা বাড়িঅলার নাতি খেয়েছে এটাও ঠিক মিলছে না। কারণ, হাতমুখ ধুতে বিটুর বেশিক্ষণ লাগেনি। ওই সময়ের মধ্যে ঘরে ঢুকে আপেল খেয়ে চলে যাওয়া নাতির পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, আপেলে দাঁতের যে দাগ পড়েছে, তা অনেক বড়ো দাঁত। বাড়িঅলার নাতির দাঁত এত বড়ো না। কয়েকদিন আগে সে তিসি আপার হাতে কামড় দিয়েছিল। তখন তিসি আপার হাতে ছোটো ছোটো দাঁতের দাগ বসে গিয়েছিল।

দাঁতের আকারের কথা ভাবতেই বিটুর মনে হলো, সে রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে! আপেলে কামড় ও দাঁতের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা কে হতে পারে। সে একটা কাগজে লিখল: 'আপেল রহস্য'। তারপর নিচে লিখল: ১. মা – ক্রস, ২. তিসি আপা – ক্রস, ৩. আলুনি খালা – ক্রস, ৪. বাড়িঅলার নাতি – ক্রস, ৫. বাবা – টিক। কিন্তু বিটু বুঝে উঠতে পারছিল না, বাবা কোন সময়ে এসে আপেলটায় কামড় বসিয়েছেন।

ঠিক তখনই বাবা মিটিং শেষ করে ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আপেলটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এখনো কেউ খায়নি এটা?' তারপর কচ কচ করে কামড় দিয়ে খেতে শুরু করলেন।

বিটু বলল, 'বাবা, তুমি কি মিটিংয়ের মাঝখানে এখানে একবার এসেছিলে?'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, এসেছিলাম। মিটিংয়ের মাঝখানে একটা ফোন এসেছিল। ফোনটা ছিল ডাইনিং টেবিলের উপরে। ফোনটা নেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলাম। তখনই দেখতে পেলাম কচকচে আপেলটা...।' ❑

শিশুসাহিত্যিক ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূতের ভয় আর নয়

আশরাফ পিন্টু

চড়ক পূজার মেলা দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। এখন বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। কিন্তু বাবা কোথায়? বাবার সঙ্গে বিশ্বজিৎ মেলায় এসেছিল। ভাতশোলার ফিঙে, বাঁশের বাঁশি, মাটির পুতুল, বিভিন্ন রকমের খেলনা এবং কদমা, বাতাসা, রসমণি ইত্যাদি লোকখাবার কেনার পর মেলার কোণে এক জায়গায় ভিড় দেখে বিশ্বজিৎ বাবার হাতে ওগুলো দিয়ে এক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিশ্চয়ই ওখানে কোনো জাদু দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, সত্যি জাদু দেখাচ্ছে এক ম্যাজিশিয়ান। সে মুহূর্তের মধ্যে এক টুকরো সাদা কাগজকে টাকা

বানিয়ে ফেলছে কিংবা হাতের মধ্যে কোনো বস্তু নিয়ে উধাও করে ফেলছে।

ম্যাজিশিয়ানের এসব জাদুর কারসাজি দেখতে দেখতে ছোট্ট বিশ্বজিৎ তাজ্জব বনে যায়। ও আগ্রহ ভরে জাদু দেখতে থাকে। কখন যে সন্ধ্যে পেরিয়ে আঁধার ঘনিয়ে আসে টেরই পায় না। দেখে মেলা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। লোকজন বাড়ির পথে হাঁটা দিচ্ছে। ও হন্যে হয়ে বাবাকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না। কী আর করা! ও মেলার লোকজনের সাথে বাড়ির পথে হাঁটা দিতে থাকে।

বিশ্বজিতের বাড়ি থেকে মেলার দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটারের মতো। ২ কিলোমিটারের মতো পথ লোকজনের সাথে এলেও তেমাথার কাছে এসে ও একা হয়ে যায়। বাড়ি পৌঁছাতে হলে এখনো ১ কিলোমিটার পথ একা একা যেতে হবে। কিন্তু আর একটু আগাতেই শ্মশান। শ্মশান পার হয়ে আরো কিছুদূর পথ গেলে তারপর ওদের বাড়ি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শ্মশানের পাশ দিয়ে সে একা কীভাবে যাবে? ওখানে নাকি ভূতের ভয় আছে? বিশ্বজিৎ ছোটো হলেও বেশ সাহসী। সে বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশনের বই পড়ে জেনেছে পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। ওর মনে সাহস সঞ্চার হয়। ও পূর্ণোদ্যমে হাঁটতে থাকে।

বিশ্বজিৎ শ্মশান পার হয়ে এসেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডেকে ওঠে। পেছন ফিরে দেখে সাদা-পাকা দাঁড়িওয়ালা ধুতি পরা এক লোক। টর্চের মৃদু আলোয় লোকটিকে রহস্যময় মনে হয়। বিশ্বজিৎ ভয় না পেয়ে বরং লোকটিকে দেখে সাহস ফিরে পায়। কাছে গিয়ে দেখে ওদের পশ্চিমপাড়ার সুশান্ত কাকা। হাতে একটি ছোট্ট টর্চলাইট। বলে, কাকা তুমি কোথা থেকে এলে?

সুশান্ত কাকা মৃদু হেসে বলে, শ্মশানে এসেছিলাম।

– কেউ মারা গেছে বুঝি?

– না।

– তবে?

– শ্মশানে বেড়াতে এসেছিলাম।

– শ্মশানে কেউ রাত্রিবেলা বেড়াতে আসে?

– বেড়াতে এবং কাজে এসেছিলাম– দুটোই বলতে পারো।

– চলো, এবার একসঙ্গে বাড়ি যাই।

– বাড়ি পরে যাবো, তারচেয়ে চলো ওইখানে বসে একটু গল্প করি। সুশান্ত কাকা হাত দিয়ে শ্মশানের একটি নির্জন স্থান দেখায়।

– রাত্রিতে কীসের গল্প! বিশ্বজিৎ একটু অবাক হয়।

সুশান্ত কাকা এক প্রকার জোর করে বিশ্বজিতের হাত ধরে টেনে শ্মশানের সেই নির্জন স্থানটিতে নিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে জ্বলা টর্চের মৃদু আলোয় বিশ্বজিৎ দেখে সেখানে কয়েকটি গাছের গুঁড়ি পড়েছিল। গ্রাম্য শ্মশান। একেবারেই নির্জন। ওদের দুজনকে ছাড়া কাউকে চোখে পড়ে না। সুশান্ত কাকা একটি গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে। এরপর বিশ্বজিৎকে আরেকটি গুঁড়ির ওপর বসার ইঙ্গিত করে। সামনে পড়ে থাকা গুঁড়ির ওপর বসতে বসতে বিশ্বজিৎ বলে, আমার সঙ্গে এমন কী কথা যে এখানে বসে বলতে হবে, বাড়িতে গিয়েও তো বলতে পারতে?

– সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না। সুশান্ত কাকা একটু থেমে শান্তস্বরে বলে, আমি আসলে গত পরশু পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছি, তখন তুমি তোমার নানাবাড়িতে ছিলে, তাই জানো না।

– তাহলে তুমি কে? বিশ্বজিৎ অবাক চোখে প্রশ্ন করে।

– আমি আসলে ভূত, তোমার সুশান্ত কাকার আত্মা।

– কী বললে! ভূত বলতে কোনো জিনিস আছে নাকি?

–তুমি ভয় পাচ্ছো না? আসলেই আমি ভূত।

– তোমাকে আমি ভয় করব কেন? আমি অনেক বিজ্ঞানের গল্প-উপন্যাস পড়েছি: এজন্য জানি যে পৃথিবীতে ভূত বলতে কোনো জিনিস নেই।

– পৃথিবীতে নেই কিন্তু অন্যগ্রহে আছে। হ্যাঁ, থাকতে পারে। হায়ার ডাইমেনশনাল কোনো গ্রহে।

– ঠিক বলেছ, আমি সেই গ্রহেরই এখন বাসিন্দা।

ওখানে আমরা 'ভূতিয়েন' জাতি নামে পরিচিত।

– কিন্তু তুমি পৃথিবীতে কীভাবে এলে?

– অশরীরীদের যাওয়া-আসার তো কোনো অসুবিধা হয় না।

– বুঝলাম না।

– তোমাদের পৃথিবীর অনেক লোকের ধারণা শ্মশানে পোড়ানোর পর খারাপ লোকেরা ভূত হয়ে যায়। আসলে খারাপ-ভালো বলতে কোনো কথা নেই, মৃত্যুর পর সকলেই ওই গ্রহের বাসিন্দা হয়ে যায়। এরপর ওখানে আমাদের উন্নত প্রযুক্তি শেখানো হয়।

– কারা শেখায় ওসব?

– ওখানে যারা আগে গিয়েছে তারা। আবার বাইরের উন্নত গ্রহ থেকে এসেও আমাদের তাদের উন্নত প্রযুক্তি শিখিয়ে যায়। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা এখন অনেক উন্নত।

– কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার কী কাজ?

– আমি তোমাকে ওই গ্রহে নিয়ে যেতে এসেছি।

– কেন?

– নিয়ে গিয়ে উন্নত প্রযুক্তি শিখিয়ে আবার ফেরত পাঠাবো; যাতে তুমি পৃথিবীতে এসে তা প্রয়োগ করতে পারো।

– আমি ছাড়া কী আর কেউ নেই?

– আছে, কিন্তু সকলেই আমাদের দেখলে ভয় পায়, 'ভূত' বলে দৌড়ে পালায়। এজন্যে আমার গবেষণা সফল হচ্ছে না।

– এখন বুঝেছি, তোমরা আসলে গবেষণার কাজে এখানে আসো।

– ঠিক ধরেছ! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সাহসী বালক; আর এজন্যেই আমাদের বিজ্ঞানীরা তোমাকে নিতে আমাকে পাঠিয়েছে। অনেকদিন ধরে আমাদের টিম তোমাকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল।

আর কথা না বাড়িয়ে সুশান্ত নামক লোকটি বিশ্বজিৎকে নিয়ে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদিকে পরদিন পেপারে নিখোঁজ সংবাদ বের হয়– 'বিশ্বজিৎ নামের এক ১২/১৩ বছরের একটি কিশোর গতকাল মেলা থেকে বাড়ি ফেরেনি। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তার সন্ধান দিতে পারলে তাকে সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।' ❑

শিশুসাহিত্যিক, বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) মঞ্জুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, পাবনা

ছুটুর হাতে রঙিন বই

নুরুল ইসলাম বাবুল

শীতের সকাল। সকালের কাঁচা রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়। ছুটু সেখানে মাদুর পেতে বসেছে। সামনে বেশ কয়েকটি পুতুল। একটা একটা করে সেগুলোর গায়ে শাড়ি পড়িয়ে দিচ্ছে। চুলে চিরুনি করছে। বিছানা পেতে শুইয়ে রাখছে। আর বিড়বিড় করে পুতুলগুলোর সাথে কথা বলছে ছুটু। পাশেই ছুটুর দাদা চেয়ার পেতে বসে আছেন। রোদ পোহাচ্ছেন। দাদির হাতে বানানো ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা খেতে খেতে ছুটুর পুতুলখেলা দেখছেন।

দাদা পরপর দুবার বললেন, ছুটু পিঠা খাও।

ছুট্টু প্রতিবারই মাথা নেড়ে জবাব দিল, এখন খাব না।

দাদি রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলেন। হাতে আরও একটা ভাপা পিঠা। ছুট্টুর পাশে বসে বললেন, খাও, এগুলো গরম-গরম খেতে হয়।

ছুট্টু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। রেগে বলল, দেখছ না, আমি পুতুলগুলোর যত্ন নিচ্ছি।

একথা শুনে ছুট্টুর মা রান্নাঘর থেকে বলে উঠলেন, আগে খেয়ে নাও, আম্মু।

ছুট্টু এবার জোর গলায় বলল, না, এখন আমি খাব না।

দাদা বললেন, থাক, ও যখন খেতে চাচ্ছে না, জোর করো না। তারচেয়ে পিঠাখানা আমাকে দাও। আমি আরও একটা খাই।

দাদি হাতের পিঠাখানা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ছুট্টুর পুতুলখেলা চলতে থাকল। দাদা দেখে হাসতে লাগলেন। সেই সাথে তিনিও ছুট্টুর সাথে খেলায় যোগ দিলেন।

একটু পরে ছুট্টুর বাবা সকালের হাঁটাহাঁটি শেষ করে ঘরে ঢুকলেন। এক ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন দাদা-নাতির পুতুলখেলা।

ছুট্টুর বাবা গোসল সেরে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। খেতে খেতে ছুট্টুর মাকে বললেন, স্কুলে বই উৎসব শুরু হয়েছে। ছুট্টুকে আজ স্কুলে নিয়ে যাও। ওকে বই এনে দাও। ওর তো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে।

মা বললেন, ও হ্যাঁ, আমাদের ছুট্টুর এখন পাঁচ বছর দুইমাস চলছে। সেদিন স্কুলের শিক্ষক বলে গেছেন, ছুট্টু এবার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

বাবা অফিসে চলে যাওয়ার পর ছুট্টুর মা, দাদা ও দাদি একসাথে খেয়ে উঠলেন। সেই সাথে ছুট্টুও খেলো।

মা এবার ছুট্টুকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আম্মু চলো, স্কুলে যেতে হবে।

ছুট্টু সাথে সাথে জবাব দিল, না, আমি স্কুলে যাব না।

মা বললেন, তোমার স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে, আম্মু। এখন স্কুলে না গেলে সবাই তোমাকে পচা বলবে।

ছুট্টু জোর গলায় বলল, বলুক পচা। আমি স্কুলে যাব না।

মা এবার জানতে চাইল, কেন স্কুলে যাবে না, ছুট্টু।

ছুট্টু বলল, আমি পুতুল খেলব। ঘর বানানো খেলব। একটু পরে আমার খেলার সাথিরা আসবে।

ছুট্টুর মা হেসে হেসে বললেন, কারা তোমার খেলার সাথি?

ছুট্টু তাড়াতাড়ি করে বলল, আশা, হিরা, মায়া, এষা, রোহান, রাইয়ান। আরও আছে।

মা এবার বললেন, ছুট্টু, ওরা এখন কেউ খেলতে আসবে না।

ছুট্টু অবাক হয়ে বলল, কেন, তুমি আসতে নিষেধ করেছ?

মা বললেন, আমি ওদের নিষেধ করিনি।

ছুট্টু আরো অবাক হয়ে বলল, তাহলে ওরা খেলতে আসবে না কেন?

মা ছুট্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ওরা সবাই এখন স্কুলে যাবে। তুমিও চলো আম্মু।

ছুট্টুর মায়ের সাথে সুর মিলিয়ে দাদা-দাদিও বললেন, হ্যাঁ, দাদুভাই, তুমিও আজ থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করো।

ছুট্টু এবার রাজি হয়ে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে নিয়ে চলো।

ছুট্টুর দাদি ছুট্টুকে সাজিয়ে দিলেন। মা-ও তৈরি হয়ে নিলেন।

একটু পরেই আশা এল ওর মায়ের সাথে। বাড়ি থেকে খানিকটা হাঁটলেই ওদের স্কুল। বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ছুট্টু, আশা আর ওদের মায়েরা ধীরে ধীরে স্কুলের দিকে পা বাড়ালেন। খুব সুন্দর একটা স্কুল। ঝকঝকে পরিষ্কার। স্কুলের আঙিনায় ফুলের বাগান। নানারকম ফুল ফুটে আছে বাগানে। ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৌমাছি আর নানা রঙের প্রজাপতি। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

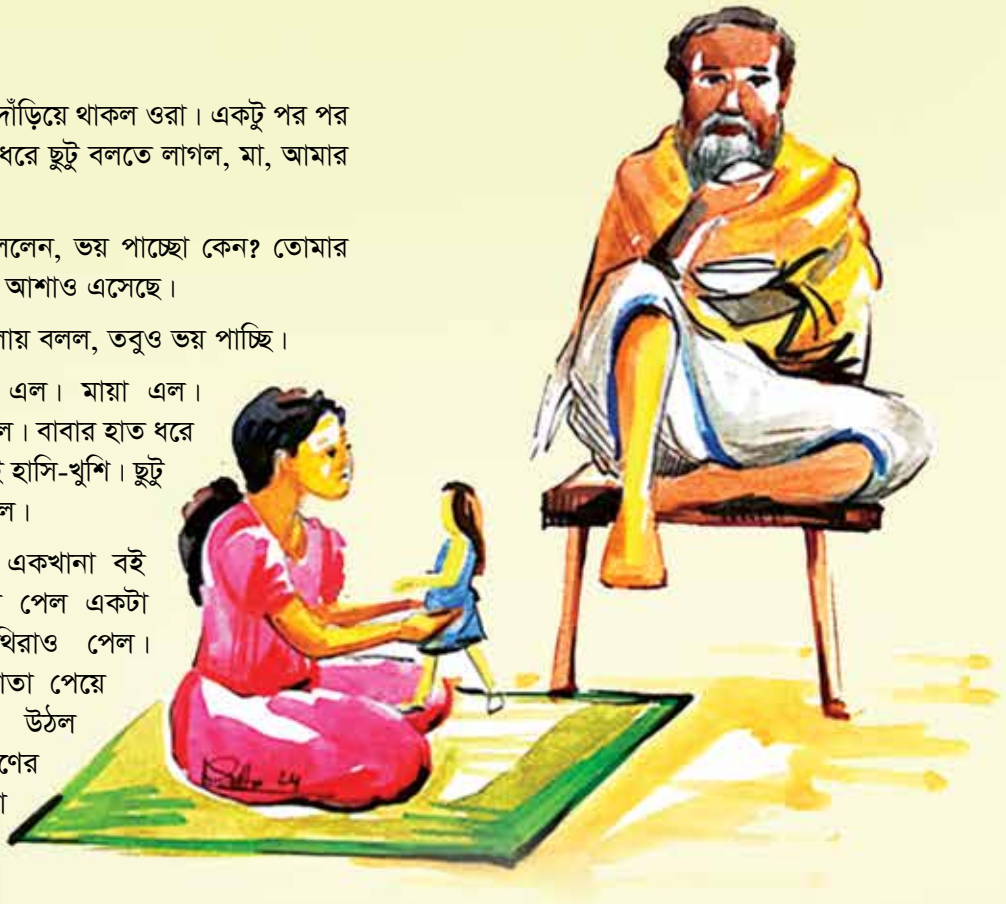

কিছুক্ষণ আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। একটু পর পর মায়ের হাত চেপে ধরে ছুটু বলতে লাগল, মা, আমার ভয় লাগছে।

মা সাহস দিয়ে বললেন, ভয় পাচ্ছো কেন? তোমার সাথে আমি আছি। আশাও এসেছে।

ছুটু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তবুও ভয় পাচ্ছি।

একটু পরে হিরা এল। মায়া এল। মাকে নিয়ে এষা এল। বাবার হাত ধরে রোহান এল। সবাই হাসি-খুশি। ছুটু এবার হাসতে লাগল।

ভর্তি হয়ে সুন্দর একখানা বই পেল ছুটু। আরো পেল একটা খাতা। ওর সাথিরাও পেল। রঙিন রঙিন বইখাতা পেয়ে আনন্দে নেচে উঠল ছুটু। কিছুক্ষণের জন্য ঢুকতে হলো ক্লাসরুমে। ওরে বাবা! স্কুলের সবচেয়ে সুন্দর রুমটা ওদের জন্য। চারিদিকের দেয়ালে রঙিন ছবি। চারকোণায় চারটি তাক। সেখানে সাজানো আছে কত্ত রকমের খেলনা। আছে একটা বানানো গাছ। সেই গাছে ঝুলছে অ, আ, ই, ঈ... ক, খ, গ, ঘ... বর্ণমালাগুলো। দেখে খুবই ভালো লাগল ছুটুর। জুলেখা ম্যাম হেসে হেসে সবার নাম জানতে চাইলেন। আদর করলেন। সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। প্রতিদিন স্কুলে এসে এই রুমে বসতে বললেন। ক্লাস শেষে ছুটু ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরে এল।

পরের দিন সকাল। প্রতিদিনের মতো কাঁচা রোদ এসে পড়েছে বারান্দায়। ছুটু মাদুর পেতে বসেছে সেখানে। পাশেই চেয়ারে বসে আছেন দাদা। পাটালি গুড় আর দাদির হাতে ভাজা মচমচে মুড়ি খাচ্ছেন তিনি। ছুটুর হাতে আজ পুতুল নেই। পুতুলের শাড়িও নেই। সে বসে আছে বই হাতে। গতকাল স্কুল থেকে পাওয়া সেই রঙিন বই। একটা একটা করে পাতা উলটাচ্ছে ছুটু। দাদা মুড়ি খাওয়ার কথা বলছেন। দাদি গুড়-মুড়ি নিয়ে বসে আছেন। ছুটুর ওই এককথা সে এখন খাবে না।

মা রান্নাঘর থেকে বললেন, আগে খেয়ে নাও, আম্মু।

এবার জোর গলায় জবাব দিল ছুটু, তোমরা দেখছ না, আমি পড়া শিখছি।

ছুটুর কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল সবাই।

হাসির রেশ রেখে দাদা বললেন, আহারে, আমার দাদু ভাইয়ের পুতুলগুলোর কী হবে!

ছুটু দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাম বলেছে, পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা।

এবার সবাই অবাক। আর ছুটু আপনমনে বই হাতে একের পর এক পাতা উলটাচ্ছে। কখনো হি হি করে হাসছে। বইখানি তার খুব পছন্দ হয়েছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক, কবি ও শিক্ষক

দানের দু'হাত বাড়াই

ফরিদ সাইদ

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে
শীতের আগমনে
দুর্ভাবনা জেঁকে বসে
গরিব-দুখির মনে।

ধনী থাকেন দেয়াল ঘেরা
উঁচু দালান ঘরে
অভাবিদের ছনের চালা
একাই ভেঙে পড়ে।

শীতের কাঁপন কাকে বলে
গাঁয়ের লোকে বোঝে
শহরবাসী আয়েশ করে
মজার খাবার খোঁজে।

আসুন এবার আপন মনে
তাঁদের পাশে দাঁড়াই
মলিন মুখে ফুল ফোটাতে
দানের দু'হাত বাড়াই।

পিঠা

উৎপল দত্ত

শীতকালে পিঠা খেতে
লাগে অনেক মজা
হরেক রকম পিঠা খেয়ে
সবার মন হয়ে যায় তাজা।

চিতই পিঠা ভাপা পিঠা
লাগে ভালো গরম গরম খেতে
তাই তো সবাই বসে
রান্নাঘরে মাদুর পেতে।

শুদ্ধ

সালাম ফারুক

আজকের শিশুরা আগামীর বিশ্ব
মন্দা ও যুদ্ধে যেন ধীর-নিঃস্ব;
হবে যা রঙিন
হয় কেন রংহীন?
ফিরে চাই শান্ত পৃথিবীর দৃশ্য।

ঘুচে যাক মন্দা মিটে যাক যুদ্ধ
হতাশায় চাই না হতে বাকরুদ্ধ;
দু'হাজার চব্বিশ
ঝেড়ে দিক সব বিষ।
হই আজ সকলে চলো পাক-শুদ্ধ।

শীতের বাঁকে

মো. শাহীনুর রহমান রিয়াদ

চুপি চুপি এল শীত
গুনগুন পাখি গায় আজ
রাখালেরা সুর তুলে
বাঁশি নিয়ে গায়
শীত শীত, করে শীত, শরীর কাঁপায়
উঠানে পড়েছে রোদ বসে আছি সেথায়
হিম হিম শীত, পৌষের দিন
কৃষানেরা ধান কেটে
আজ তাদের উৎসবের দিন
পাকা পাকা সোনা ধান
বাউলের সুরে তান
গাই জন্মভূমি বাংলার গান

হেনার দাদু

মাশহুদা মাধবী

দাদু যে খান চমনবাহার,লং,সুপুরি, পান
পানের সাথে চুন ও খয়ের, জর্দা, তবক চান।
দাদি যত্নে পানটি সাজান, দাদু মজায় খান।
হেনার দাদু, সবার প্রিয় পারভেজ পালোয়ান।
তিনি কিন্তু বেবি হেনার বন্ধু, ডিয়ার, জান।
দুজন মিলে ডিনারে খান গরম বাটার নান।
হেলদি সালাদ, সবজি, আলু, দেশি মুরগির রান,
সব শেষে দই আর ফল,এটা দাদুর প্রাণ।
শীত সকালেও হাঁটতে চান, তাই পার্কে যান,
গায়ে জড়ান সাদা কালার পশমি আলোয়ান,
আমি হলাম ফরিদপুরের ফেমাস পালোয়ান...
রসিক দাদু স্বভাব মতো করেন এমন ফান।
হেঁড়ে গলায় দাদরা, ত্রিতাল রাগে গানও গান।
বলেন দাদু যা তো জাদু, এক খিলি পান আন।

চড়ুইভাতি

ইমরান খান রাজ

তীব্র শীতে কাঁপছে মানুষ
কাঁপছে পশুপাখি,
শীতের রাতে খোকাখুকু
করছে চড়ুইভাতি।
শালিক পাখি খাচ্ছে রস
মনের আনন্দে,
গাছি ভাই গুড় বানায়
ঢোলের ছন্দে।
ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু
কোমলতায় থাকে,
সূর্যিমামা উঁকি দিয়ে যায়
কুয়াশার ফাঁকে।

মা মানে তো বাংলাদেশ

ইমরান পরশ

মা মানে তো বাংলাদেশ
মা মানে তো মাটি
মায়ের চেয়ে আর কী বলো
স্নিগ্ধ পরিপাটি।

মায়ের মতো দেশ আমাদের
মা জননী ডাকি
মায়ের মধুর মুখখানা এই
বুকের ভেতর রাখি।

সুখ দুঃখ কান্না হাসি
মায়ের পাশে থাকি
মা আমাদের আগলে রাখে
মায়ায় মাখামাখি।

মাকে ভালো রাখতে সবাই
হাত রেখেছি হাতে
একাত্তরে প্রমাণ দিয়েছি
সন্দেহ নেই তাতে।

মাকে ভালো রাখার জন্য
জীবন বাজি রাখি
মা যদি না ভালো থাকে
কেমনে ভালো থাকি।

তিন বন্ধু

শামস্ নূর

আহমেদ, মোহামেদ আর আবেদিন। তিন বন্ধু ওরা। তিনজনের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব।

শৈশব থেকেই তারা একসঙ্গে খেলে, ঘুরে বেড়ায় এমনকি নিত্যনতুন অভিজ্ঞতাগুলো একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে। আবেদিনের বাবা সম্ভ্রান্ত বংশের একজন ব্যক্তি। ছেলে আবেদিন ও তার দুই বন্ধু আহমেদ, মোহামেদকে নিয়ে বাদশাহর প্রাসাদে গেল। তখন তারা ছোটো নয়। সদ্য তারুণ্যে পৌঁছেছে। বাদশাহর প্রাসাদে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো এক বাগান। তাতে ফুল গাছে রঙিন ফুল ফুটে রয়েছে, ফল গাছে রং-বেরঙের স্বাদের ফল ধরে রয়েছে। সেই বাগানে তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখতে পেল অপরূপা সুন্দরি এক শাহজাদিকে। কিন্তু সে কথা তারা একজন অন্যজনের কাছ থেকে চেপে গেল। এটিই ছিল তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিগত ব্যাপার যা একে অন্যের কাছে গোপন রাখল।

কিছুদিন পর তিন বন্ধু বুঝতে পারল, তাদের বিয়ে করার সময় হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বভ্রমণে বের হবে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে। দুই বছর পর তারা তাদের নিজ শহরে ফিরে আবার দেখা করবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনজন তিন দিকে রওনা হলো।

দুই বছর পার হলো। আহমেদ একশ মুদ্রা জমিয়েছিল, তখনকার দিনে এই পরিমাণ মুদ্রা অনেক মুদ্রা হিসাবে ধরা হতো। ফেরার পথে হঠাৎ করে একজন আয়নাওয়ালার সঙ্গে তার দেখা। লোকটি মিষ্টি সুরে বলছিল, 'এই জাদুর আয়নাটি কিনো, নিজের একজন বন্ধু কিনো।'

আহমেদের মনে কৌতূহল জাগল। এই জাদুর আয়না দিয়ে একজন কী করতে পারবে?

আয়নাওয়ালা বলল, 'বন্ধু আমার, এটি বিশেষ ধরনের এক আয়না, যা একটিই আছে সারা তুর্কি জুড়ে। তুমি যা-ই দেখতে চাইবে, সেটা যেখানেই থাকুক না কেন, তা-ই দেখতে পাবে এই আয়নাটি ঘষে।

আহমেদ বেশ প্রলুব্ধ হলো। সে তার প্রিয়তমা শাহজাদির কথা ভাবছিল, যাকে সে এই আয়নার সাহায্যে দেখতে পারবে। সে তার কাছ থেকে আয়নাটি কিনে বিদায় নিল এবং তার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। আয়নাটা পেয়ে সে খুব খুশি ছিল।

অন্যদিকে মোহামেদও তার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলছিল। সে আহমেদের চেয়ে বেশি মুদ্রা উপার্জন করেছিল, তার সাথে ছিল একশ বিশ মুদ্রা।

যখন সে শহরের ব্যস্ত বাজারটি অতিক্রম করছিল, একজন ব্যাবসায়ী চিৎকার করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'মাত্র একশ বিশটি মুদ্রায় পাবে একটি জাদুর কার্পেট। এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়ো না বন্ধু।'

মোহামেদ থামল এবং অনুসন্ধান করতে লাগল। ব্যাবসায়ী তাকে বলল, 'এই জাদুর কার্পেটটি আশ্চর্য রকমের, তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাবে যেখানে তুমি যেতে চাও। তোমাকে শুধু এখানে বসতে হবে এবং তোমার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।'

মোহামেদ তার একশ বিশটি মুদ্রা ব্যাবসায়ীকে দিল এবং দ্রুত রওনা দিল তার দুই বন্ধুকে কার্পেটটি দেখানোর জন্য।

আবেদিন তিন বন্ধুর মধ্যে সর্বশেষ জন। একশটি মুদ্রা জমিয়েছিল সে। ফেরার পথে সে দেখল একজন ফলওয়ালা চেঁচিয়ে বলছে, 'এই লেবুটির দাম একশটি মুদ্রা। শুধুমাত্র একশটি মুদ্রা আমার এই জাদুর লেবুর জন্য।'

আবেদিন তার কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এই লেবু এত দামি কেন? এর বিশেষত্বই বা কী?'

লেবুওয়ালা চেঁচিয়ে বলল, 'ভালো কথা জনাব, আপনি পুরো তুর্কি জুড়ে এই লেবুর মতো আর কোনো লেবু খুঁজে পাবেন না। এই লেবু যে-কোনো রোগ ভালো করতে পারবে। এটি কাটার পরে যে এই লেবুর মিষ্টি ঘ্রাণ শুকবে, সে যে-কোনো অসুস্থতা থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে।'

আবেদিন বলল, 'এই নাও একশটি মুদ্রা তোমার সেই বিশেষ লেবুর জন্য।' সে তারপর তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য রওনা দিল।

খুব তাড়াতাড়ি তিন বন্ধু আবার একসাথে হলো। তারা একে অপরের কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল।

আহমেদ বলল, 'আমার বন্ধুরা, আমি নিজের জন্য ভালো কিছু করেছি। আমি একশটি মুদ্রা জমিয়েছিলাম। আসার পথে এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়েছিল, সে একটি জাদুর আয়না আমার কাছে বিক্রি করে। এটি কিনে বেশ ভালো কাজ হয়েছে। আমি যা দেখার ইচ্ছা করব তা এই আয়নাতে দেখতে পাবো।'

এরপর মোহামেদ তাদেরকে তার গল্প বলল, 'আমার বন্ধুরা, আমি বেশ ভালো একটি জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমি একশত বিশটি মুদ্রা জমিয়েছিলাম। সেগুলো দিয়ে আমি একটি জাদুর কার্পেট কিনেছি যা দ্রুততম পাখির গতির মতো, আমি যেখানে যেতে চাইব, আমাকে সেখানেই নিয়ে যাবে।'

আবেদিন দ্বিধাগ্রস্থ ছিল, 'আমি যে একশটি মুদ্রা জমিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে আমি একটি জাদুর লেবু কিনেছি। একজন অসুস্থ ব্যক্তি, হতে পারে সে পুরুষ বা নারী, এটি অর্ধেক কাটার পর এর মিষ্টি ঘ্রাণ শুকবার পর ওই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যেতে পারে।'

আবেদিন সবেমাত্র শেষ করল তখন আহমেদ প্রস্তাব করল, 'চলো বন্ধুরা আমরা আমাদের জাদুর জিনিসগুলো ব্যবহার করি।'

তারা তিনজন গাদাগাদি করে একসাথে জাদুর আয়নার দিকে তাকালো। প্রত্যেকের একই ইচ্ছা ছিল–শাহজাদিকে দেখার।

'দেখো দেখো, শাহজাদি আয়নায় উপস্থিত হলো! কিন্তু সে তো বিছানায় শুয়ে আছে, খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তাকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

তিন বন্ধু অনেকটা হতাশ হয়ে গেল। তখন তাদের মনে পড়ল মোহামেদের জাদুর কার্পেটের কথা। তারা কার্পেটের ওপর উঠল এবং শাহজাদির কাছে চলে গেল।

বাদশাহ এবং বাদশাহ পত্নী খুব আশ্চর্য হলো এই তিন যুবককে তাদের মেয়ের কক্ষে দেখতে পেয়ে। তারা কীভাবে এখানে এল তা জানতে চাওয়ার আগেই আবেদিন বলল, 'মহামান্য বাদশাহ, আমরা শাহজাদিকে জাদুর আয়নায় দেখেছিলাম এবং তাকে দেখতে এসেছি। আমরা এখানে উড়ে এসেছি আমাদের জাদুর কার্পেটের সাহায্যে। আমাদের কাছে একটি জাদুর লেবু আছে যেটি অর্ধেক কাটার পর এটির মিষ্টি ঘ্রাণ যদি শাহজাদি শুকতে থাকে তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

যখনই শাহজাদি লেবুর ঘ্রাণ শুকল তার শরীরে রং ফিরে এল। সে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এবং বিছানায় উঠে বসল।

বাদশাহ এবং বাদশাহ পত্নী এই অলৌকিক ঘটনা দেখে অভিভূত হলো। তারা এই তিন যুবককে পুরস্কার দিতে চাইল। তাই তারা শাহজাদির হাত তাদের তিনজনের মধ্যে যে-কোনো একজনকে দিতে চাইল।

যেহেতু তিন বন্ধুই শাহজাদিকে গভীরভাবে ভালোবাসত, তাই তাদের মধ্যে তিক্ত বিরোধ ছিল। প্রত্যেকে তাদের চাপা দাবি প্রকাশ করল। আহমেদ বলল, 'আমার জাদুর আয়না ছাড়া শাহজাদি যে অসুস্থ তা কী করে জানতে পারতাম?'

'আমার জাদুর কার্পেটের জন্যই আমরা সময় মতো তার কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলাম, না হলে এখনো সে অসুস্থ থাকত।' মোহামেদ বলল।

আর সবশেষে আবেদিন বলল, 'আমার জাদুর লেবু ছাড়া শাহজাদি সুস্থ হতে পারত না।'

বাদশাহ কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। এই তিনজনের প্রত্যেকেই শাহজাদির যোগ্য।'

তাই তিনি বিচারককে আদেশ দিলেন এটি বিচার করার জন্য যে, শাহজাদিকে পাওয়ার জন্য কে সবচেয়ে বেশি যোগ্য?

প্রত্যেকে তাদের আবেদন বিচারকের সামনে পেশ করল।

'এটি ছিল আমার আয়না যার সাহায্যে আমরা শাহজাদিকে দেখতে পেয়েছিলাম এবং তার অবস্থা জানতে পেরেছিলাম।' আহমেদ এই আবেদন করল।

'এটি ছিল আমার কার্পেট যার সাহায্যে আমরা দ্রুত আসতে পেরেছিলাম শাহজাদিকে দ্রুত সাহায্য করার জন্য।' মোহামেদ এই আবেদন করল।

'এটি ছিল আমার লেবু যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিল শাহজাদির জন্য।' আবেদিন এই আবেদন করল।

বিচারক ধৈর্যের সাথে সবার কথা শুনল। তারপর আহমেদের দিকে ঘুরল। এরপর বলল, 'এই নাও একশটি মুদ্রা তোমার জাদুর আয়নার জন্য, তুমি কিছুই হারাওনি।'

মোহামেদের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'এই যে তোমার টাকা যেটা তুমি খরচ করেছিলে তোমার কার্পেটের জন্য, তুমিও কিছুই হারাওনি।'

সবশেষে এল আবেদিনের পালা। বিচারক বললেন, 'পুত্র, আমি তোমাকে বলব না তুমি কত টাকা খরচ করেছ এই জাদুর লেবুর জন্য। তোমার লেবুটি কেটে অর্ধেক করা হয়েছে আর এটি কখনো ঠিক করা যাবে না। তুমি কষ্ট করে এই লেবুটি কিনেছিলে যেন এটি কারো উপকারে আসে। আর সে কারণে তুমিই ন্যায্য দাবিদার।'

বাদশাহ, বাদশাহ পত্নী এবং উপস্থিত সবাই বিচারকের বুদ্ধির জন্য হাততালি দিচ্ছিল। আবেদিনের সঙ্গে শাহজাদির বিয়ে হয়ে গেল এবং তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। এরপর অনেক অনেক বছর পর দুজনে বাদশাহ ও বাদশাহ পত্নী হয়ে তাদের রাজ্য পরিচালনা করেছিল। ❑

গবেষক বাংলা একাডেমি

সাপের হাতি গেলা

মুহাম্মদ বরকত আলী

গ্রীষ্মকাল। আগামীকাল থেকে পাঠশালা গরমের ছুটি। ছুটি পেয়ে সকল ছাত্রের মনে সে কী আনন্দ! পণ্ডিত মশাই বললেন, 'ছুটিতে তোরা যেখানে বেড়াতে যাবি ফিরে এসে সেখানকার গল্প শোনাবি।' পাঠশালায় সাধারণ প্রজাদের ছেলেদের সাথে রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে, সেনাপতির ছেলেসহ রাজার পেয়াদার ছেলেরাও পড়ে। ছুটি পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে আহ্লাদে মজা করতে করতে সবাই বাড়ির দিকে রওনা হলো। কেউ বলছে নানির বাড়ি যাব, কেউ বলছে দাদার দাদার বাড়ি যাব, কেউ বলছে খালার বাড়ি, ফুপার বাড়ি যাব। আম-জাম-কাঁঠাল কত রকমের ফল

খাবে। এজন্যই এই মাসকে বলা হয় মধু মাস। কালু মন খারাপ করে বসে আছে। গরমের ছুটি কাটাতে কালুর বন্ধুরা সবাই কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। কালু কোথায় যাবে? ছুটির শেষে তাকেও যে পণ্ডিত মশাইকে গল্প শোনাতে হবে। কালু বেচারা পড়েছে বিপদে। যাবার মতো তার তো তেমন কেউ নেই। কালু তার বাবার কাছে বলল, 'বাজান, আমার সব বন্ধুরা কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাবে। আমার কি কেউ নেই যে সেখানে বেড়াতে যাব? ছুটি শেষে সবাই পণ্ডিত মশাইকে একটা করে ছুটি কাটানোর গল্প শোনাবে। এটা পণ্ডিত মশাইয়ের ইচ্ছে। যে গল্প বলবে না, তাকে পাঠশালা থেকে বিদেয় করে ছাড়বে। আমি কোন গল্প শোনাবো বাজান?' কালুর এই আক্ষেপের কথা শুনে ওর বাজান বলল, 'কে বলেছে তোর কেউ নেই? হিজলতলা গ্রামে তোর এক দাদা আছে। আমার দুঃসম্পর্কের এক আত্মীয় হয়। আমাকে খুব দরদ করত। তোকে সাথে করে কাল ওখানেই যাব।' কালু খুশিতে নাচতে লাগল। রাতে তার ঘুম হলো না। সকালবেলা ঘুম থেকে জেগেই দুই বাপ-ছেলে বের হলো হিজলতলা গায়ের উদ্দেশ্যে। সেকালে গাড়ি-ঘোড়া কম ছিল। মানুষ পায়ে হেঁটে হেঁটেই এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়াতো। ক্রোশকে ক্রোশ তারা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত।

কালু তার বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। জমির আল ধরে হেঁটে যাচ্ছে আর নানা রকম গল্প করছে বাপ-ছেলে। মাঠে একটা হাতি চরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় কালু চেঁচিয়ে বলল, 'বাজান, হাতির পায়ে সাপ...!' কালুর কথা শেষ না হতেই ওর বাজান বলল, 'ও কিছু না, সাপে হাতি গিলছে।' একটা সাপ হাতির পায়ে মুখ লাগিয়ে আছে। কালুর বাজান বুঝে হোক আর না বুঝে হোক কিংবা কালু ভয় পাবে সেই ভয়ে হোক কথাটা যখন বলেই ফেলেছে যে, সাপে হাতি গিলছে তখন আর কী করার।

পরক্ষণেই জিভে কামড় দিয়ে মনে মনে বলল, 'এই যা, কী বলতে কী বলে ফেললাম। এখন যদি ছেলেকে বলি সাপে হাতির পায়ে কামড়িয়ে ধরেছে তাহলে ছেলে ভাববে বাজান মিথ্যা বলছে। তাই আর কিছুই বলল না। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কালুর বাজান বলল, 'যা দেখলি একথা কিন্তু কাউকে বলবি না। কোথাও বের হলে পথে বাঁধা পড়লে সেখানে যেতে নেই। আজ পথে যখন বাঁধা পড়ল তখন আর যাওয়াটা ঠিক হবে না কালু। চল আমরা বাড়ি ফিরে যাই। অন্য কোনো দিন তোর দাদা বাড়ি গেলেই হবে।' কালুর আর বেড়ানো হলো না। এরই মধ্যে গরমের ছুটি শেষ। কিন্তু কালুর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। ছুটি শেষে পাঠশালায় এসে সবাই একে একে তাদের বেড়ানোর গল্প বলল। যার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সে তাই বলল। পণ্ডিত মশাই কালুকে বলল, 'কীরে কালু তুই কি কোথাও বেড়াতে যাসনি? তোর কী অভিজ্ঞতা হলো বল?'

কালু বলল, 'আমার বেড়াতে যাওয়া হয়নি। আমি আর বাজান বেড়াতে যাচ্ছিলাম দাদার বাড়ি। পথের মধ্যে একটা ঘটনা দেখেই বাজান বলল আজ অশুভ ঘটনা দেখলাম, আজ আর যেতে হবে না। অন্য কোনো দিন যাব। তাই বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর আর যাওয়া হয়নি।' পণ্ডিত মশাই বলল, 'কী সেই ঘটনা, খুলে বল শুনি?' কালু বলল, ' যেতে যেতে দেখি সাপে হাতি গিলছে. . .।' এতটুকু বলতেই সকলেই হো হো হো করে হেসে উঠল। পণ্ডিত মশাই বলল, 'দূর পাগল, সাপে হাতি গিলতে পারে?' কালু জোর দিয়ে বলল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। নিজের চোখকে কী করে অবিশ্বাস করতে পারি?' পণ্ডিত মশাই বলল, 'এতটুকু ছেলে এখনি আমার সাথে একটা মিথ্যে কথা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিস? এই বেতটা নিয়ে আয় তো।' এরই মধ্যে সেনাপতির ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পণ্ডিতজি, এই কথাটা কালু পাঠশালায় এসেই বলেছে। কালু রাজপুত্রের সাথে এ নিয়ে বাজি ধরেছে।' রাজাপুত্র বলল, 'কালুর কথা মিথ্যে, সে আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন আমাদের শর্ত পূরণ কর কালু। শর্ত অনুযায়ী কালু ঘোড়া হবে আর আমরা একে একে সবাই ওর পিঠে চড়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলব।' পণ্ডিত মশাই বললেন, 'কালু এবার বল কী করবি?' কালু বলল,

‘পণ্ডিতজি, আমার একটা অনুরোধ, আমার বাপজান কিন্তু সাক্ষী আছে। বাপজানের কাছে শুনতে পারেন আমি সত্য বলছি কিনা মিথ্যে বলছি।’ পণ্ডিত মশাই বলল, ‘এই তোরা ওর বাপজানকে ডেকে নিয়ে আয়।’ কালুর বাপজানকে ডেকে আনা হলো। পণ্ডিত মশাই বলল, ‘আপনার ছেলে কালু বলছে সে নাকি দেখেছে সাপে হাতি গিলছে। আপনিও নাকি তাই দেখেছেন। এখন সত্যটা বলেন কী ঘটেছে?’ কালুর বাপজান বলল, ‘পণ্ডিত মশাই, কালু ছোটো মানুষ কী দেখতে কী দেখেছে। তাই কী বলতে কী বলেছে। ক্ষমা করে দিন।’ পণ্ডিত মশাই বললেন, ‘আমি না হয় কিছু মনে করলাম না, কিন্তু এই কথা নিয়ে ও রাজপুত্রের সাথে বাজি ধরেছে। এখন বাজির শর্ত পূরণ করতে হবে যে। কী আর করার কালুকে এ কথা নিয়ে ঘোড়া হতে হয়েছিল। রাজপুত্রের ইচ্ছে বলে কথা। কালু বাড়ি এসে বলল, ‘বাজান, তুমি না নিজের চোখে দেখলে আর তুমিই তো আমাকে বললে, সাপে হাতি গিলছে?’ কালুর বাজান বলল, ‘ সে কথা আমি আর তুই ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই তোকে বলেছিলাম, এই কথা কাউকে বলবি না। আমি জানতাম এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।’

কিছুদিন পর কালুদের একটা গাভির বাছুর হলো। বাছুর হওয়ার প্রথম দিন কালুকে তার বাজান বলল, ‘কালু, বাছুরটাকে টেনে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে আয়।’ বাড়ির পাশেই একটা ছোটো পুকুর ছিল। কালু জোর করে বাছুরটাকে পুকুরের পানিতে নামিয়ে দিল। বাছুরটা একটা ডুব দিয়ে উঠে আসতেই কালুর বাজান বাছুরটা গাভির বাটে লাগিয়ে দিল। বাছুরটা দুধ খেতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন সকালে গোয়াল থেকে বাছুরটা খুলে দিয়ে পুকুরে নামিয়ে দেওয়া হয় ধাক্কা মেরে। পুকুর থেকে উঠে আসতেই গাভির বাটে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দু-এক মাস পর দেখা গেল বাছুরটা এখন ছেড়ে দেওয়ার পর লাফাতে লাফাতে পুকুরে সাঁতার কেটে ডুব দিয়ে উঠেই গাভির বাটে লেগে যায়। এখন পুরোপুরি অভ্যাস হয়ে গেছে।

একদিন কালু পাঠশালায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করল, 'জানিস, আমাদের বাছুরটা গোসল না করে দুধ খায় না?' একথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। পূর্বের মতো এবারও রাজারপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র বিশ্বাস করল না। কালু এবার বেশ মোটা অঙ্কের মুদ্রার বাজি ধরল। পণ্ডিত মশাইকে ঘটনা জানালে তিনি বললেন, 'কী সব আজগুবি গল্প করিস কালু? তোর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? এবারও তুই বাজিতে হেরে যাবি। খামোখা রাজপুত্রের সাথে তর্ক করে বাজি ধরিস।' কালুর বাজানকে ডেকে আনা হলো। কালুর বাজান বলল, 'অপরাধ নিবেন না পণ্ডিত মশাই, কালু সত্যি কথাটাই বলেছে। আমাদের বাছুরটা গোসল না করে তার মায়ের দুধ পান করে না।'

পণ্ডিত মশাই বললেন, 'এটা অসম্ভব। আমি প্রমাণ দেখতে চাই।'

কালুর বাজান এবার জোর দিয়ে বলল, 'তাহলে আপনারা সকলেই আমার বাড়ি আসেন কাল সকালে। দেখবেন আমি সত্য বলছি না মিথ্যে বলছি।' পরের দিন সকালে পণ্ডিত মশাইসহ রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র সকলেই এল। কালু গোয়ালঘর থেকে বাছুরটা ছাড়তেই দৌড়ে গিয়ে পুকুরে দিল এক লাফ। সাঁতার কেটে আর ডুব দিয়ে উঠে এসেই গাভির বাটে লেগে গেল। সকলে অবাক। প্রমাণ চোখের সামনেই। সকলেই নিজের চোখেই দেখল। কালুর পাওনা মিটিয়ে দিলো ওরা। পণ্ডিত মশাই কালুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে?' কালুর বাজান বলল, 'বাছুরটার জন্মের পর থেকেই এই অভ্যাসটা করিয়েছি। তাই এখন আর পুকুরে নামিয়ে দিতে হয় না। সকালবেলা ছেড়ে দিতেই এই নিয়মগুলো বাছুরটা একা একাই করে থাকে। সবকিছুই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যে যা অভ্যাস করবে তার সেটা সম্ভব হবে। ওই যে সাপে হাতি গেলার মতো।' এই কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগল। পণ্ডিত মশাইয়ের বুঝতে বাকি রইল না যে, কালুর বাবার সাপের হাতি গেলা প্রমাণ করতেই এই আয়োজন। ❑

গল্পকার

বাংলা ও বঙ্গবন্ধু

ডা. হারুন-অর-রশিদ

এক সময়ে এ বাংলা ছিল
অপরূপ শস্য-শ্যামল
নদী, পাহাড় প্রকৃতি শোভিত
গভীর বনাঞ্চল।

এসেছিল নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়
মোঙ্গল আর আর্যরা
সব মিলে এক জাতি হয়েছিল
তারাই বাঙালিরা।

একদা এই বাঙালি জাতি
ছিল অনেক ধনী
কৃষিপণ্য আর সুবিখ্যাত মসলিন
রপ্তানিতে আয়, তা সবাই মানি।

অনেকেই চাইল স্বাধীনতা
বিক্ষিপ্ত ছিল দাবি
এগিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু
যিনি রাজনীতির কবি।

শতধা বিভক্ত বাঙালিদের
বাঁধল একই সুরে
জীবনকে বাজি রেখে তিনি
ডাকলেন জোরেশোরে।

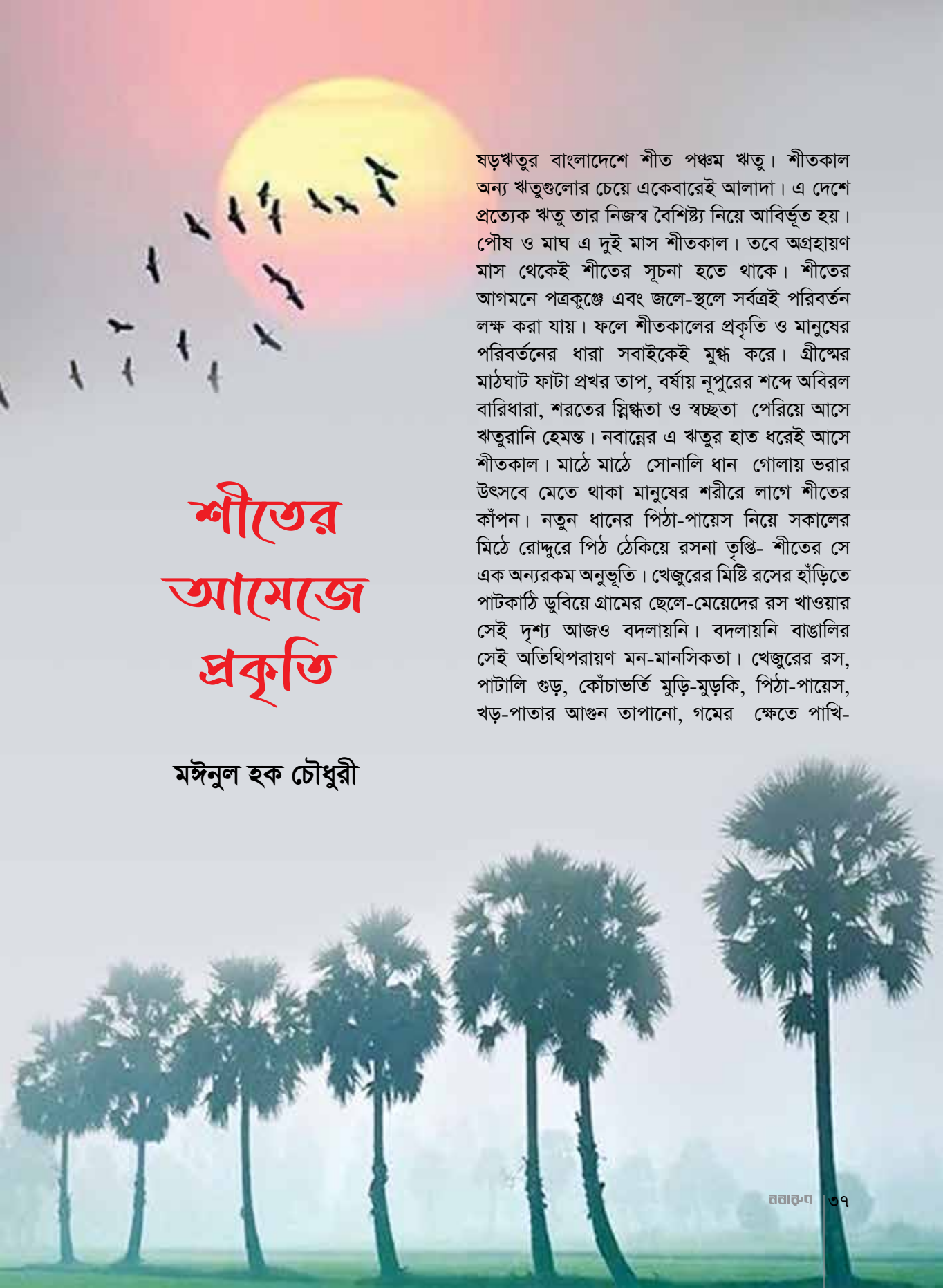

শীতের আমেজে প্রকৃতি

মঈনুল হক চৌধুরী

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে শীত পঞ্চম ঋতু। শীতকাল অন্য ঋতুগুলোর চেয়ে একেবারেই আলাদা। এ দেশে প্রত্যেক ঋতু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। পৌষ ও মাঘ এ দুই মাস শীতকাল। তবে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শীতের সূচনা হতে থাকে। শীতের আগমনে পত্রকুঞ্জে এবং জলে-স্থলে সর্বত্রই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ফলে শীতকালের প্রকৃতি ও মানুষের পরিবর্তনের ধারা সবাইকেই মুগ্ধ করে। গ্রীষ্মের মাঠঘাট ফাটা প্রখর তাপ, বর্ষায় নূপুরের শব্দে অবিরল বারিধারা, শরতের স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছতা পেরিয়ে আসে ঋতুরানি হেমন্ত। নবান্নের এ ঋতুর হাত ধরেই আসে শীতকাল। মাঠে মাঠে সোনালি ধান গোলায় ভরার উৎসবে মেতে থাকা মানুষের শরীরে লাগে শীতের কাঁপন। নতুন ধানের পিঠা-পায়েস নিয়ে সকালের মিঠে রোদ্দুরে পিঠ ঠেকিয়ে রসনা তৃপ্তি- শীতের সে এক অন্যরকম অনুভূতি। খেজুরের মিষ্টি রসের হাঁড়িতে পাটকাঠি ডুবিয়ে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের রস খাওয়ার সেই দৃশ্য আজও বদলায়নি। বদলায়নি বাঙালির সেই অতিথিপরায়ণ মন-মানসিকতা। খেজুরের রস, পাটালি গুড়, কোঁচাভর্তি মুড়ি-মুড়কি, পিঠা-পায়েস, খড়-পাতার আগুন তাপানো, গমের ক্ষেতে পাখি-

তাড়ানো, লেপ-কম্বলের উত্তাপ, কুয়াশা ঢাকা ভোরে ও সন্ধ্যায় আনন্দ-কষ্টের মিশেল নিয়ে আমাদের জীবনে শীতকাল উপস্থিত হয়। শীতের মিঠে রোদ, কুয়াশার চাদর, উঠোনের কোণে মাটির চুলায় রান্না, চুলার পাশে বসে বসে হাতের তালু গরম করে নেওয়া, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর উদাম শরীরের শিরশির কাঁপুনি, চায়ের কাপের সাদাটে ধোঁয়া, হলুদের ডালি বিছানো সর্ষের মাঠ-এসব ছবি আর ছবির পেছনের গল্প আমাদের খুব বেশি চেনা। আরো আছে গ্রামের স্কুল মাঠে যাত্রা-সার্কাস-অপেরায় মাতোয়ারা সব রাত। শীতকাল এমন এক সময় যখন সারা পৃথিবী সম্ভবত 'ঘুমের ঘোরে' প্রবেশ করে। ঠান্ডা বাতাস, শক্ত মাটি আর মৃতপ্রায় গাছগাছালিতে আচ্ছন্ন এই সময়ে যেন তেমন কিছুই করার থাকে না। শীতকে কেউ কেউ 'নীরবতা ও অন্ধকারের অনুভূতি' বলে প্রকাশ করতে চান। সাধারণত শীতের রাত দীর্ঘ হয়। এ সময়ে তীব্র ঠান্ডায় নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় প্রকৃতি। এরই মাঝে মানুষ ঘরে ফিরে সারা রাত্রিতেই কম্বল, লেপ এবং কাঁথা মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে গভীর তন্দ্রায় নিমজ্জিত হয়। যদিও দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য শীতকাল বড়ো কষ্টের বার্তা নিয়ে আসে। তারপরও শীতল রাত্রি শেষে ভোর হয় অন্যরকম এক রূপ নিয়ে। ঘন কুয়াশার চাদরে প্রকৃতি থাকে ঢাকা। ধানক্ষেত বা শাকসবজির ওপরে টলমল করা শিশির বিন্দু, সূর্যের সোনালি রশ্মি এক প্রকার মুক্তার মতোই মনে হয়। সরিষা ফুলের হলুদ ক্ষেত আর মৌমাছির গুঞ্জনের দৃশ্য দেখলে মন পুলকিত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে শুরু হয় শৈত্যপ্রবাহ। এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা খুব নিচে নেমে আসে। হাড় কাঁপানো তীব্র শীত গ্রামবাংলার মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়। সাধ্যমতো শীতবস্ত্র কেনার ধুম পড়ে যায় এসময়। শীতের সকালে ও রাতে ছিন্নমূল মানুষ আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা চালায়। চায়ের দোকানগুলোতে ধুম পড়ে যায়। এসময় উত্তর গোলার্ধ অর্থাৎ বরফে আচ্ছাদিত দেশসমূহে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। পাখিদের আশ্রয়স্থলটুকু হারিয়ে যায়। তাই জীবনের সন্ধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানা প্রজাতির পাখি ক্লান্তিহীনভাবে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসে এ বাংলায়। অতিথি পাখির আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠে বাংলার নদনদী, খাল-বিল, হাওর, ঝিল, জলাশয় ও বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল। পাখিরা প্রতি বছর অগ্রহায়ণের শেষে ও পৌষ মাসের শুরুর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে আসতে শুরু করে। এর মধ্যে রয়েছে নীলশির, লালশির, কালো হাঁস, লেনজা হাঁস, খুদে গাংচিল চুটকি, ফুটকি, লেঙ্গাসহ প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি। আমাদের দেশে দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর, সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা চিড়িয়াখানার জলাশয়গুলোসহ গোপালগঞ্জ, খুলনা ও যশোরের বিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পার্বত্য এলাকাসহ কয়েকটি উপজেলায় অতিথি পাখির বিচরণ চোখে পড়ে। শীত মানেই নির্জীব প্রকৃতি আর শুধুই জড়তা নয়। শীতের ফুল প্রকৃতিতে আনে প্রাণের ছোঁয়া, যেন ফুলের উৎসবে ভরে উঠে চারপাশ। কুয়াশার শুভ্র আবরণ ভেদ করে শত ফুল মাথা উঁচিয়ে জানান দেয় তাদের সৌন্দর্যের

উপস্থিতি। বাগান, আঙিনা, ছাদ আর পথের ধার হয়ে উঠে রঙে আর রূপে বর্ণিল। শীতের ফুলের মধ্যে অন্যতম হলো- গোলাপ, কৃষ্ণকলি, গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী, চন্দ্রমলিকা, বোতাম, কারনেশন, জিনিয়া, কসমস, পিটুনিয়া, পর্টুলেখা, হলিহক, এস্টার, সুইটপি, ফ্লকস্, ভার্বেনা ইত্যাদি। ফুলগুলো আমাদের দেশে জন্মালেও শীতের অধিকাংশ ফুলের জন্মস্থান এদেশে নয়। ফুলের রানি গোলাপের দেখা মেলে সারাটি বছর, তবে শীত এলে প্রতিটি বাগান ভরে যায় নানা রঙের গোলাপে।

শীতের সময়ে খাবার তালিকাতে আসে বেশ পরিবর্তন। কেবল শাকসবজি নয় ফলের দিক থেকে শীতের ডালিমসহ এসব ফলে আছে ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'এ', মিনারেল, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন 'ই', এন্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবারসহ আরো অনেক ভিটামিনের। এসব মৌসুমি ফল কেবল মুখরোচকই নয়, এতে থাকা নানা ভিটামিন এবং মিনারেলসহ ফাইবার দাঁত, মাড়ি মজবুত করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি নানা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। এসব ফলের মধ্যে থাকা কমলালেবু যেমন ক্যানস্যারের সেল শরীরে তৈরি হতে দেয় না তেমনি এতে থাকা ভিটামিন 'সি' নানা ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ রোগ প্রতিরোধ করে। কিডনি সমস্যা থেকে শুরু করে কোষ্ঠকাঠিন্য, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণসহ নানা রোগ প্রতিরোধ করে শীতকালীন ফল সফেদা। এছাড়া হার্ট সুস্থ রাখতে ডালিম অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বছরের অন্যান্য সময় বাজারে টাটকা সবজি কম পাওয়া গেলেও শীতকালে বাজারে প্রচুর পরিমাণে শীতকালীন শাকসবজি পাওয়া যায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, গাজর, শিম, টমেটো এবং শীতকালীন সবজিতে ভরপুর থাকে বাজার। পালংশাক, মুলাশাক, লালশাকসহ নানা জাতের টাটকা শাকও পাওয়া যায়। শীত ঋতু আমাদের অনেকেরই প্রিয় ঋতু। অনেকেই অপেক্ষা করে শীতের জন্য। শীত আসে প্রকৃতিকে বদল করে দিতে। নতুন করে প্রকৃতিকে সাজিয়ে দিতে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

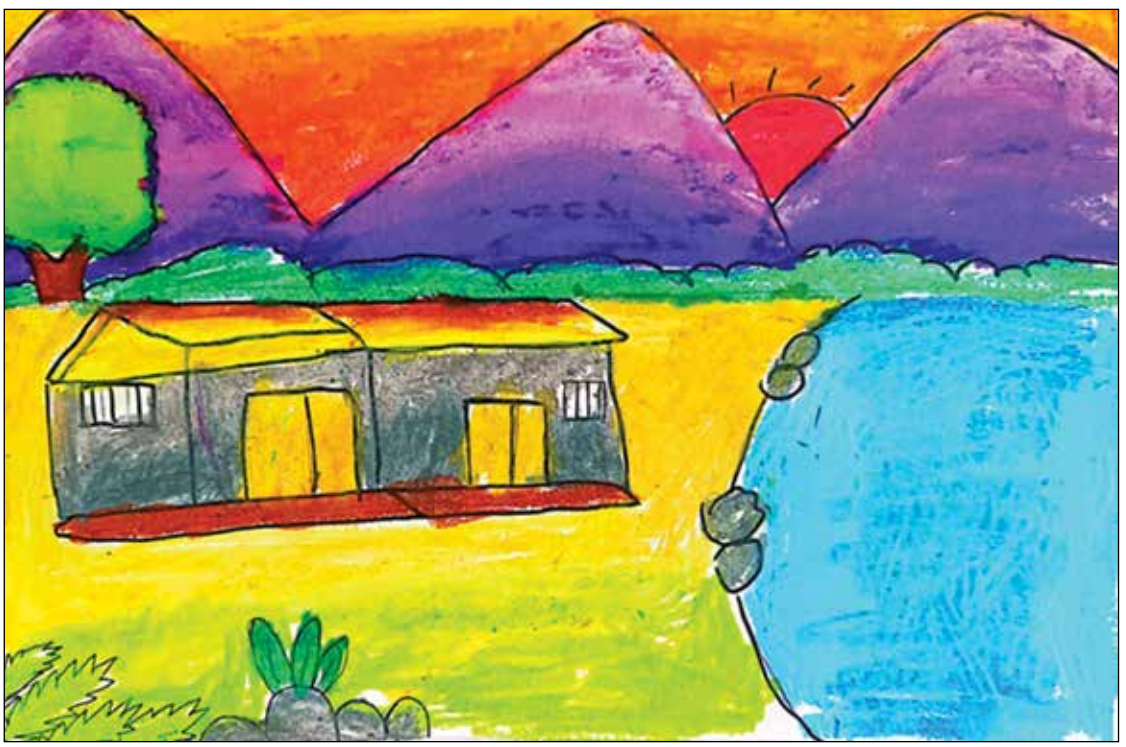

রাইনা দত্ত, দ্বিতীয় শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট

শীতের সকাল

মাহ্‌মূদ বিক্রম

শীত পড়েছে রসের হাঁড়ি
নামায় গাছি চাদর গায়,
সর্ষে ক্ষেতে হলুদ ফুলে
মৌমাছিরা ছুটে যায়।

হিমেল হাওয়া গায়ে কাঁটা
তিরতিরিয়ে বয়ে যায়,
শিশির ভেঙে জবুথুবু
হাটুরিয়া হাটে ধায়।

মালসাখানি সামনে নিয়ে
বুড়াবুড়ি তাপ পোহায়,
চটের ছালায় আসন পেতে
গরম গরম পিঠা খায়।

শীতের ছড়া

নীহার মোশারফ

শীতে কাঁপে বুড়ো-বুড়ি
কত ছেলে-মেয়ে
মাঠে-ঘাটে কুয়াশায়
গান ওঠে গেয়ে!

খানাদানা, পিঠেপুলি
ঘোরাঘুরি কত
স্বপ্নের পাখি এসে
হাসে অবিরত!

টিকলির দিনলিপি

সাবাহ্ নূর তৌফিকা

বাবার কাছ থেকে নেওয়া পাঁচশ টাকার হিসাব নিয়ে খুব টেনশনে আছে টিকলি। ও নিজেকে ফের প্রশ্ন করে, কীভাবে বান্ধবীদের কাছে টাকা চাইব? কয়েকদিন আগে তমাল হোসেন তার মেয়েকে স্কুলের সোয়েটার কেনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। টিকলি সেদিন স্কুলের ক্যান্টিনে সোয়েটার পায়নি। টাকাটা বাবাকে ফেরতও দেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে স্কুলের ক্লাস পার্টির দিনটি চলে আসে। তিনজন বান্ধবী মিলে ক্লাস টিচারের জন্য গিফট কিনে, ওই গিফট কেনার জন্য তিনশ টাকাই টিকলি দিয়ে দেয়। কিন্তু দুইজন বান্ধবী নিজেদের ভাগের টাকা এখনো পরিশোধ করেনি। সেই টাকার অবশিষ্ট টাকাগুলো একজন দুঃস্থের হাতে তুলে দিয়ে মেয়েটি এখন মহাচিন্তায় পড়ে গেছে। তমাল অফিসে যাওয়ার আগে টেবিলে টিকলিকে বলে, সোয়েটার যেহেতু পাওনি, তোমার তো টাকাটা আমাকে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল।

তমাল অফিস থেকে বাসায় ফিরে মেয়ের দেখা পায়নি। সকালের বিষয়টা তার মনে পড়ে যায়। সম্ভবত ওই কারণে মেয়ে বাবার সামনে আসছে না। টিকলির অভ্যাস সম্পর্কে বাসার সবাই অবগত। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় দশ টাকা-বিশ টাকার জন্য বায়না ধরে। মা কিংবা বাবা পাঁচ টাকা দিতে চাইলে ভেংচি কাটে, আমি কাউকে পাঁচ টাকা দিই না। এখন পাঁচ টাকা কেউ কাউকে দেয়?

আজ টিকলির মনটা ভালো নেই। মন খারাপ থাকলে কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতে পারে না। টম অ্যান্ড জেরির মতো সারাদিন যে ভাইয়াটির পেছনে লেগে থাকে, ওর থেকেও দূরে থাকে। রাতে টিকলির খেতে ইচ্ছে করে না। ভালো লাগছে না–বলে রাতের ডাইনিং টেবিল এড়িয়ে যায়। ওর মনের মধ্যে ছোটো ছোটো কয়েকটি বিষয় ঘোরপাক খাচ্ছে। অন্যদের কাছে

তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিষয়গুলো পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েটিকে ভীষণ ভাবায়। পড়ার টেবিল থেকে নোটবুকটি হাতে তুলে নেয়। এই নোটবুকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে রাখে জীবনের নানা আনন্দ-বেদনার গল্প। আজও তেমন কিছু লিখতে নোটবুকের পাতায় কলম ধরে টিকলি।

'আচ্ছা! বাবা বলেন, আমি নাকি আমার দাদির মতো হয়েছি। আমার দাদিজান দরিদ্রদের দান করতে ভীষণ পছন্দ করতেন। আমি তো দাদিকে দেখিনি। তিনি তো আমার এক বছর ছয়দিন বয়সের মাথায় আমাদের সবাইকে ছেড়ে গেছেন। বাবার মুখে গল্প শুনেছি, দাদি নাকি বলতেন–আমার নাতনিকে 'টিকলি'র মতো মাথায় সযত্নে রাখবে। বাবা আমার জন্য সুন্দর অর্থের একটি নাম রাখলেও দাদির দেওয়া ওই 'টিকলি' নামটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি বাবা-মাকে প্রায়ই মজা করে বলি, দাদির রাখা এই 'টিকলি' নামে তোমরা আবার আমার আকিকা দাও।

থানা বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষমাণ আমাদের স্কুল বাসের পাশে কয়েকজন সাহায্যপ্রার্থী প্রতিদিন বসে থাকে। আমি যখন উনাদের 'আন্টি-আংকেল' বলি ভাইয়া তখন হাসে আর আমাকে ক্ষ্যাপায়। ভাইয়া বাবাকে জানায়, জানো, টিকলির এক আন্টি আজ কী করেছে! তোমার মেয়ে তাকে দশ টাকা দিয়েছে। ওই মহিলা নাকি কান্না শুরু করতেই ও আরো দশ টাকা দেয়। তাতেও তার দাবি মিটে না। সে ওষুধ কেনার কথা জানায়। তৃতীয় দফায় ওর কাছে থাকা সব টাকা তাকে দিয়ে দেয়। পুরো মাস ধরে জমানো টিফিনের দুইশত টাকা দিয়ে দিতে কোনোরকম দ্বিধা করেনি। ভাইয়ার হেসে হেসে বলা কথাগুলো শুনে সেদিন রাগে আমার মাথা ঝিমঝিম করেছে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ কান্না পেয়েছে। এখন যেমন পাচ্ছে।'

এখন টিকলির আর কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। ওর দু'চোখ অশ্রুতে ডুবে গেছে। দাদিজানের কল্পিত মুখচ্ছবি ওর দু'চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। একরাশ অভিযোগ নিয়ে দাদিকে প্রশ্ন করে, বলো তো আমার কী দোষ? আমি তোমার নাতনি বলেই তো এই অভ্যাসটি আমার মধ্যে এসেছে। আচ্ছা, আমার মতো বয়সে তোমার ভাইয়া, বাবা-মা তোমাকে এসব নিয়ে বকা দিতো?

আজ টিকলির মন ভালো নেই। ওয়াশরুম থেকে ফিরেই ঘুমানোর পরিকল্পনা করে। আগামীকাল স্কুলের জন্য ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগতে হবে। মা-বাবার ঘর থেকে বাবার কণ্ঠ শুনতে পায়, এই স্বার্থপরের দুনিয়ায় আমাদের মেয়েটা একদম অন্য রকম হয়েছে। এমন দান করার মানসিকতা এখনকার শিশু-কিশোরদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। বাবার কথার সাথে মা যোগ করেন, ঠিকই বলেছ। জানো, গতকাল কী হয়েছে! কেনাকাটা করতে প্রিন্স বাজারে যাচ্ছি। জ্যামে বসে আছি। মাথায় ব্যান্ডেজ করা একজন গাড়ির গ্লাসে টোকা দিয়ে সাহায্য চাইল। লোকটির জন্য দশ টাকার নোট বের করতেই তোমার মেয়ে আমাকে ধমক দিল, উনাকে কী তোমার ফকির মনে হচ্ছে! কম করে হলেও উনাকে পঞ্চাশ টাকা দাও। আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ওই যাত্রায় তোমার মেয়ের কথা থেকে রক্ষা পাই। মায়ের কথা ধরে বাবা বলেন, এমন মহৎ গুণটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে ওকে সহযোগিতা করতে হবে। দান করার আত্মা সবার থাকে না। অভ্যাসটি ধরে রাখতে পারলে মৃত্যুর পর সন্তানের এমন ভালো কর্মের জন্য আমরাও পুরস্কৃত হব। যা হোক, টিকলিকে এসব নিয়ে কোনো রকম বকাঝকা করো না। তবে বাস্তবতাটুকুও ওকে বুঝাতে হবে।

বাবা-মায়ের কথা শুনে টিকলির মনটা আনন্দে থই থই করতে থাকে। ফুরফুরে মন নিয়ে ও ঘুমের দেশে হারিয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে–ডেভেলপার কোম্পানি ওর বাবা-মাকে ফ্ল্যাট দুটো বুঝিয়ে দিয়েছে। একটায় ওরা স্বপরিবারে থাকছে। অন্যটিতে কয়েকজন আন্টি-আংকেলকে থাকতে দিয়েছে। ডাক্তার টিকলি প্রতিদিন রোগী দেখছে। দরিদ্রদের কাছ থেকে ভিজিট তো নিচ্ছেই না, উলটো ঔষধ কেনার টাকা দিয়ে দিচ্ছে। এরকম শান্তির ঘুম জীবনে কখনো ঘুমায়নি এই কিশোরী। রাতে দেখা এমন সুখ স্বপ্নের গল্প টিকলি ওর দিনলিপিতে লিখে রাখতে চায়। ❑

ষষ্ঠ শ্রেণি, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা

ছুটির গল্প

আলমগীর কবির

দলছুট একটা রঙিন ডানার প্রজাপতি আমায় ডেকে বলল, কে তুমি? ঘাসের বিছানায় শুয়ে থেকে আমি জবাব দিলাম,আমার নাম আবির।

ঘাসের বিছানায় শুয়ে থেকে আকাশ দেখছিলাম। খোলা আকাশ। আকাশের বুকে সাদা সাদা তুলোর মতো মেঘ। সাদা রঙের একেকটা প্রজাপতি নাকি? আকাশপুরে কোনো ফুলের বাগান আছে? উড়ে উড়ে যাচ্ছে কোথায় প্রজাপতি মেঘ?

কোথা থেকে যেন একঝাঁক চড়ুই এল ঘাসের বনে।

আমাকে দেখে চড়ুই পাখিগুলো উড়ে গেল না। বরং কাছেই শস্যদানা খুঁটে খুঁটে খেতে থাকল।

ঘাসবনের ওপাশে মটরশুঁটির খেত। মটরশুঁটির ফল ধরার সময় এখনো হয়নি। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে সারা খেত। ওপাশ থেকে চাচাতো ভাই রিফাত হঠাৎ ডেকে উঠল,আবির, আবির জলদি করে আয় এদিকে।

এক দৌড়ে ছুটে যায় রিফাতের কাছে। রিফাতের হাতে দেখে একটা ডানাভাঙা পাখি।

কোথায় পেলি?

কুড়িয়ে পেলাম। জলদি করে পানি আন।

আবার আমি এক দৌড়ে পাশের খেতে যাই। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় জলের দেখা পাই। দুই হাতে করে জল নিয়ে ফিরে আসি। ডানাভাঙা পাখির মাথায় জল ঢেলে দিই। জল খাইয়ে দিই দুজন মিলে। কোনো শিকারির কবল থেকে বেঁচে ফিরেছে হয়ত পাখিটা। ডানায় আঘাত লেগেছে।

আমরা অনেকক্ষণ পাখির সেবা করি। তারপর একটা শিম খেতের মাচায় পাখিটাকে রেখে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকি।

আমার পরীক্ষা শেষ হতেই মা-বাবার সাথে গ্রামে দাদুবাড়ি বেড়াতে এসেছি। বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মেঠোপথে খালি পায়ে হাঁটছি। ঘাসে ঘাসে এখনো শিশির লেগে আছে। শিশিরকণা বারে বারে ধুয়ে দিচ্ছে পা।

পরীক্ষা শেষ। ইশকুল ছুটি। হোমওয়ার্ক নেই। গাড়ির কোনো হর্ন নেই। শব্দদূষণ নেই। বায়ুদূষণ নেই। বাতাসে কান পাতলেই পাখিদের কিচিরমিচির গান। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। রিফাতকে ডেকে বলি, কোথায় যাবি এখন? বাড়ি?

রিফাত বলে, আরে না। চল নদীর কাছে যাই। আমাদের নদীটা ছোটো। নদীর পানি এখন অনেক কমে গেছে। চল দেখি মাছ ধরা যায় কিনা।

নদীর তীরে যেতেই দেখি এলাহি কাণ্ড। পানি সেচে অনেকেই মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি আর রিফাত সেই দলে ভর্তি হয়ে যাই। তড়িঘড়ি করে জলে নেমে পড়ি।

সারা গায়ে কাদা লেগে যাচ্ছে।

যাক, আজকে না হয় বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি খাব! ❑

গল্পকার

গল্প

টাকি মাছের বুদ্ধি কত

নকুল শর্ম্মা

একটা ছোট্ট ডোবায় থাকত একটা টাকি মাছ।

ডোবাতেই বড়ো হতে থাকে সে। এদিকে বর্ষা পেরিয়ে শীত এসে গেছে। ডোবায় খুব অল্প পানি। কোনোমতে বেঁচে আছে টাকি। সহসা বৃষ্টিও হবে না। ওদিকে পাশের খালটাও শুকিয়ে আসছে প্রায়। বড়ো জলাশয়ে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ। টাকি মাছটা মনে মনে প্রহর গুণে কখন আসবে বোশেখ মাসের বৃষ্টি। চলছে অগ্রহায়ণ মাস। পৌষ আসি আসি করছে। একদিন হঠাৎ দেখে মেঘ ধরেছে আকাশে। বাহ, অবেলায় বৃষ্টি হবে নাকি! খুশি হলো টাকি। এক পশলা বৃষ্টি হয়েই ঝলমল করে উঠল শীতের আকাশ। ছোট্ট ডোবার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালটিতে অল্প পানি জমেছে। টাকি মাছ ভাবল এবার এক লাফে খালে চলে যাবে। তারপর লাফিয়ে যাবে বড়ো কোনো জলাশয়ে। সাত-পাঁচ না ভেবেই দিল লাফ। ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল টাকি। কিন্তু বিপদে পড়তে দেরি হলো না তার। হঠাৎ কোথা থেকে এল এক দাঁড়কাক। কাক মাছটাকে দেখে যেই ঠোঁটে ধরতে গেল তখনই মাছটা বলল, 'কাক তো তণ্ডুল পাখি'। মাছের কথা বুঝতে না পেরে কাক বলল, তণ্ডুল মানে কী? টাকি বলল তুমি কাক। সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি। আর তুমি তো তণ্ডুল খাও। এর মানে হলো চাল বা ভাত। তুমি শুধু শুধু আমাকে খেয়ে কেন তোমার মুখের স্বাদ নষ্ট করবে? নিজের প্রশংসা শুনে কাক আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, ভাই

টাকি, তুমি বড়ো উপকার করলে। তোমার কারণে নতুন শব্দও শিখলাম। যাও আজ তোমাকে ছেড়েই দিলাম। কাক চলে গেল। টাকি আবার সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। বিপদ তবুও কাটে না। এবার একটা শিয়াল দেখতে পেল মাছটাকে। শিয়াল এসে ধরতে যাবে, অমনি টাকি বলে উঠল 'শৃগাল চন্দ্রমুখী'। প্রথমে না বুঝলেও টাকি মাছ যখন বলল শিয়াল চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ে, কারণ শিয়াল দেখতে চাঁদের মতো। তখন শিয়াল তো গর্বে আটখানা। তার মুখখানা কিনা চাঁদের মতো! মাছের প্রশংসা শুনে শিয়ালও টাকিকে খেলো না। বুদ্ধির জোরে টাকি এবারও বেঁচে গেল। আবারও যাত্রা শুরু। চলছে তো চলছেই। অনেকটা পথ চলে এসেছে। এবার আরেক বিপদ। কোথা থেকে লাফিয়ে এল মস্ত এক কোলাব্যাঙ। মাছটিকে যেই ধরতে যাবে অমনি টাকি বলে উঠল, 'রাজপুত্র কোলা ব্যাঙ। তোমার খোঁজে রূপকথার রাজকন্যা হয়রান।' এ কথা শুনে ব্যাঙ তো খুশিতে মশগুল। রূপকথার গল্প অনুযায়ী রাজকন্যা চুমু দিলেই তো সে রাজপুত্র হয়ে যাবে! ব্যাঙও মাছটাকে খেলো না। টাকি চলল নিজের গন্তব্যে। কিন্তু কপাল খারাপ হলে তা কি আর খণ্ডানো যায়?

মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এক কৃষক। টাকি মাছটা চোখে পড়তেই খপ করে ধরে নিয়ে এল বাড়িতে। কৃষকের বউ ওটাকে রান্না করার আয়োজন করল। উঠোনে ছাইবঁটি নিয়ে কুটতে বসেছে। সবে কানকো দুটো কাটতে যাবে, অমনি একটা চিল ছোঁ মেরে টাকি মাছটাকে নিয়ে চলে গেল গাছের মগডালে। সঙ্গে সঙ্গে টাকি বলল, চিলের কী থাবা! ও রে বাবাগো বাবা! প্রশংসা শুনে চিলও ছেড়ে দিলো টাকিকে। টাকি গিয়ে পড়ল সোজা পুকুরে। এরপর দিন গেল, মাস গেল।

একদিন সেই কৃষকের বউ মাছটাকে দেখতে পেয়ে বড়শি নিয়ে এল পুকুরে। বড়শি দেখে টাকি বলল,

যতই বড়শি ফেলো না কেন, আমি বাপু আর টোপ গিলছি না। এতকিছু পার হয়ে এসেছি যে, আমার সব জানা হয়ে গেছে। আমাকে ভোলানো এত সহজ নয়। ❑

গল্পকার

শীত

সামুরাই নিশি

ধরণির নিয়মেতে প্রকৃতি চলবে...
প্রতি বছর তাই শীত আসবে।

সকালের রবি উঠে মৃদু হেসে,
কুয়াশা ভেঙে গায়ে লাগে এসে।

গরম চায়ের চুমুকে উষ্ণতার রেশ,
মুড়ির সাথে খেতে লাগে বেশ।

গোধূলির সূর্যটা ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন,
যেন সন্ধ্যা সহসাই আসন্ন।

উত্তরের হাওয়ায় গাদা ফুলের গন্ধ,
প্রজাপতি উড়ে নিয়ে ডানায় ছন্দ।

সবুজ পাতা ধীরে ধীরে হলুদ আভা ধরে,
রাশি রাশি শুকনো পাতা ঝরে ঝরে পরে।

দশম শ্রেণি, বাসাবো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আমার গ্রাম

রাহিমা তাবাসসুম

ছোট্ট একটি গ্রাম
পদ্মা নদীর তীরে।
চাইলেই খুঁজে পাবে
হাজার নদীর ভিড়ে।

শ্যামল ছায়ায়-মায়া ঘেরা।
আমার চোখে সেরা
চারদিকেতে গাছগাছালি
মাছে পুকুর ভরা।

আমার গ্রামের কৃষক ভাই
মাঠে ফলায় ধান।
আনন্দে গেয়ে উঠে
জারি সারি গান।

স্নাতক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ZZxq wekh×

ওয়াহিদ মুস্তাফা

এক আছে বন। সে বনে নানা প্রাণী। আছে হরেক রকমের গাছপালা। সেই বনের নাম আমাজন। বনের চারভাগের তিনভাগ আর্জেন্টিনার আর বাকি একভাগ ব্রাজিলের। কিন্তু বনের রাজা ফ্রান্স। একসময় এ বনে তুমুল আন্দোলন হলো। তখন বনের রাজা বলেন, তোমরা দুইদল যুদ্ধ করো। যে দল জিতবে সেই দলে আমি। এদিকে আর্জেন্টিনার আছে এক লাখ সৈন্য, তিনটি ট্যাংক, চারটি নিউক্লিয়ার বোমা, দশটি ফ্রিগেট, একশটি মিসাইল ও বিশটি যুদ্ধবিমান, আর প্রধান সেনাপতি মেসি।

অন্যদিকে ব্রাজিল দলে আছে নয়টি মিসাইল, এগারোটি যুদ্ধবিমান, দুই লাখ সৈন্য, দুইটি ট্যাংক, নিউক্লিয়ার বোমা দশটি এবং প্রধান সেনাপতি নেইমার।

যুদ্ধ শুরু হলো। চারদিকে মারমার, কাটকাট। কড়াৎ কড়াৎ। বুম বুম। কত প্রাণী যে মরল তার ঠিকঠিকানা থাকল না। এভাবে যুদ্ধ চলল একমাস। হঠাৎ একদিন দুই সেনাপতি মুখোমুখি। দুই বন্ধু তো অবাক। মেসি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে: বন্ধু তুমি!!

নেইমারও অবাক হয়ে প্রশ্ন করে: তুমি, বন্ধু!! আমরা দু'বন্ধু এই যুদ্ধ করছি!! ছি! ছি! আমাদের কাজ তো মাঠে, ফুটবল নিয়ে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ তো আমাদের নয়!

মেসি তখন বন্ধু নেইমারকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে- থামাও যুদ্ধ, থামাও! ❑

পঞ্চম শ্রেণি, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, বাঘারপাড়া, যশোর

খাসিয়া পুঞ্জি

এস এম মাসুদ

খাসিয়া বাংলাদেশে বসবাসরত একটি মাতৃতান্ত্রিক নৃগোষ্ঠী। এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এদের গায়ের বর্ণ তাম্রবর্ণের, নাক-মুখ চ্যাপটা, চোয়াল উঁচু, চোখ কালো ও ছোটো টানা টানা এবং খাটো। খাসিয়ারা প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর আগে আসাম থেকে বাংলাদেশে আসে। তারা আসামে এসেছিল তিব্বত থেকে। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, খাসিয়ারা বাংলাদেশের ৪৫টি জনজাতির একটি। এরা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় হলেও কম্বোডিয়ার 'খেমার' গোত্রভুক্ত।

খাসিয়া আদিবাসীরা ছয়টি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলো হলো লেংদু, সিংতে, লিংগাম, পনার, ভুই ও বার। ছয়টি গোত্রের মানুষ একই পুঞ্জিতে মন্ত্রীর অধীনে বাস করে। তবে খাসিয়াদের নিজ গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। অন্য গোত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়। নারীরা কনেযাত্রী নিয়ে বিয়ে করে বর নিয়ে আসেন বাড়িতে। আর তারা নিজেদের বাড়িতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে স্বামী-সন্তানসহ বসবাস করে থাকেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত খাসিয়াদের কোনো পুরুষ সম্পত্তির মালিক হন না। সব সম্পদের মালিক হন নারীরা। তবে পরিবারের স্ত্রীর মূল্যায়ন বেশি হলেও স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা মিলেমিশে বসবাস করেন। এদের বংশপরিচয় দেওয়া হয় মায়ের বংশানুক্রমে। বর্তমানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আসল বৈশিষ্ট্য থেকে প্রায় বিচ্যুত খাসিয়া সম্প্রদায়। সিলেট জেলায় যে কয়টি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন, তার মধ্যে খাসিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এদের অধিকাংশই সীমান্ত অঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশে খাসিয়াদের বসবাস মূলত সিলেটের জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট উপজেলায়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও কুলাউড়া উপজেলায় এবং সুনামগঞ্জ জেলায় তাদের বসবাস রয়েছে।

আদিবাসী খাসিয়ারা যেসব পাহাড়ি এলাকায় দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, সেই গ্রামগুলোকে পুঞ্জি বলে। পুঞ্জি প্রধানকে সিয়েম বলা হয়। একজন হেডম্যান বা মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে প্রায় ৪০টি খাসিয়া পরিবার বসবাস করে থাকে। খাসিয়াদের ঐতিহ্য ও আয়ের প্রধান উৎস পান-সুপারি চাষ করা। এছাড়া বর্তমানে অন্যান্য চাষাবাদ, পশুপালনও করছে তারা। খাসিয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণত যে-কোনো বর্ণের বড়ো তিন টুকরা কাপড়। পুরুষরা প্রচলিত যে-কোনো পোশাকই পড়ে থাকেন। খাসিয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতি

রয়েছে। নৃত্য-সংগীত তাদের খুবই প্রিয়। গান, কবিতা থেকে শুরু করে নাচ, নাটক, গল্প শিল্প-সাহিত্যের সব শাখাই খাসিয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। আদিবাসী খাসিয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব-বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। নিজেদের ঐতিহ্যময় কৃষ্টি আর সংস্কৃতি চর্চায় হাসি-আনন্দে পুরাতন দিনগুলোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আহ্বান করে এই জনগোষ্ঠী।

সিলেটের প্রকৃতিকন্যা জাফলংয়ে একটি আকর্ষণীয় খাসিয়া পুঞ্জি রয়েছে। মেঘালয়ের খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় আর জাফলংয়ের বুক চিরে বয়ে গেছে ধলাই ও পিয়াইন নদী। নদীর তীর ঘেঁষেই সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে খাসিয়া পুঞ্জি। দূর থেকে দেখে মনে হয় আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে নরম তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘরাশি। জাফলংয়ে খাসিয়া সম্প্রদায়ের পাঁচটি পুঞ্জি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- বল্লা, সংগ্রামপুঞ্জি, নকশিয়াপুঞ্জি, লামাপুঞ্জি ও প্রতাপপুর। পাঁচটি পুঞ্জিতে প্রায় আড়াই হাজার খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। খাসিয়া পুঞ্জিতে রয়েছে খাসিয়া রাজবাড়ী, বাজার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গির্জা ও একটি বিদ্যালয়। সংগ্রামপুঞ্জির বুক চিরে যাওয়া রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখা যায় পান-সুপারির সারি সারি বাগান। সবুজের মাঝে পাখপাখালির ডাকাডাকি আপনাকে মুগ্ধ করবে। তার পাশেই রয়েছে সুবিশাল সমতল ভূমির চোখজুড়ানো চা বাগান। খাসিয়াদের প্রতিটি বাড়িঘর মাচাংয়ের মতো, ৫-৭ ফুট উঁচুতে বিশেষভাবে তৈরি দোতলা বাড়ি। প্রতিটি খাসিয়া বাড়ির সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারা বছরের সঞ্চিত জ্বালানি কাঠ। আর এসব কাঠ এমন সারিবদ্ধভাবে তারা রেখেছে যে, এ যেন কোনো শৈল্পিক কাজ। এরা শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। প্রতিটি বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা দিনভর গাছ থেকে পান আহরণ করেন আর মহিলারা সেগুলো কুচি করেন। খাসিয়াদের পান পাতা সংগ্রহ ও খাঁচা ভর্তির দৃশ্যও মুগ্ধ করে পর্যটকদের। ❑

অফিস সহকারী, ডিএফপি

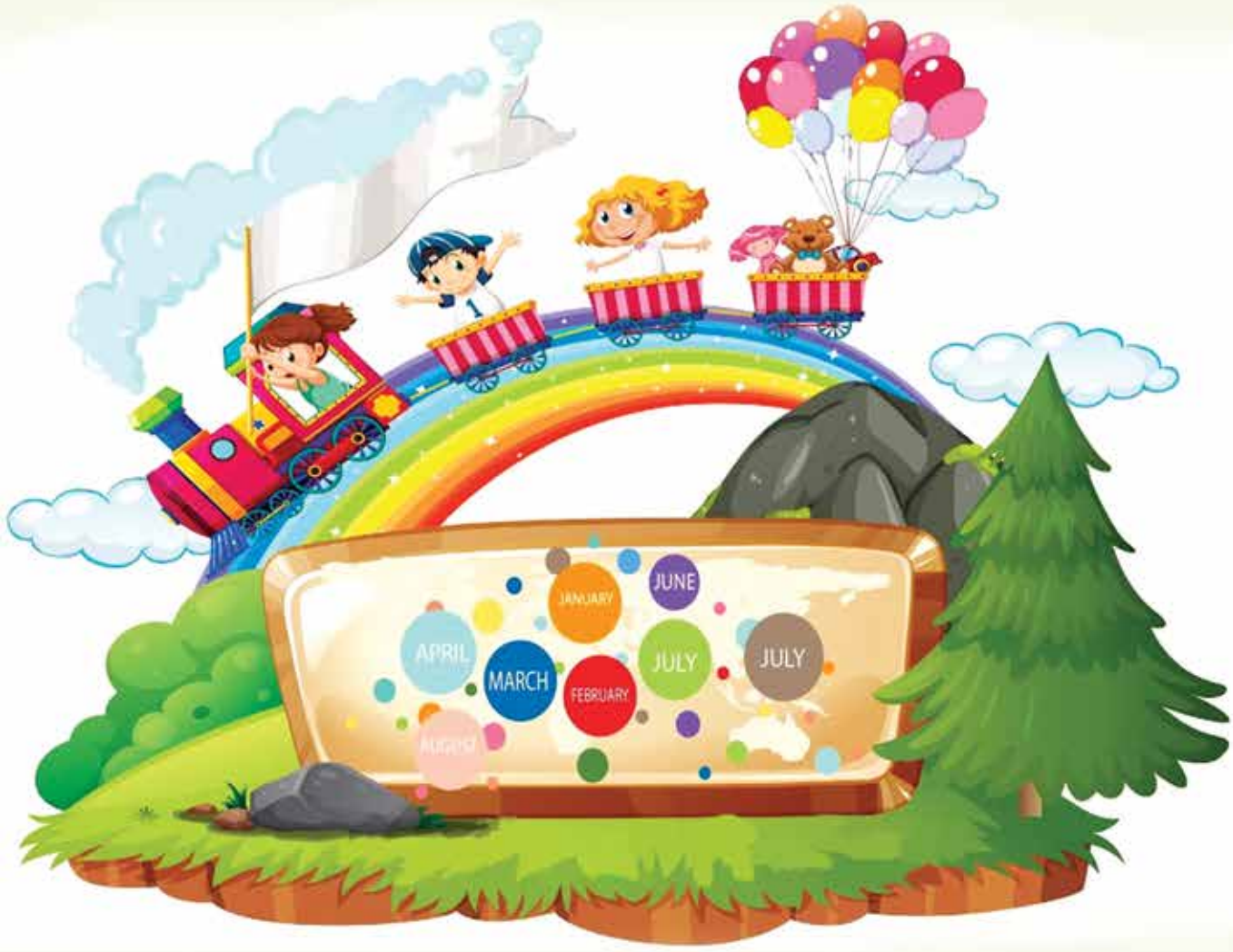

যেভাবে পেলাম ইংরেজি বছর ও মাস

কাজী মো. আবু নাছের

অবশেষে চলে এল আরো একটি নতুন বছর। ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানালো গোটা বিশ্ব। নববর্ষ মানেই নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাওয়া। বন্ধুরা, জেনে নেই কীভাবে পেলাম নতুন বছর ও ইংরেজি মাসগুলো।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে শুরু হয় ইংরেজি নতুন বছর। তবে, প্রথম নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্যাবিলনে। সময়টা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ। সূচনালগ্নে রোমান ক্যালেন্ডারে দিনসংখ্যা ছিল ৩০৪। আর মাস ছিল ১০টি। সূর্যের পরিক্রমণ কালের সঙ্গে মিল রাখতে ক্যালেন্ডারে অতিরিক্ত ৯০টি দিন যোগ করেছিলেন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার। এভাবেই 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে'র সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ২৫শে ডিসেম্বরকে নববর্ষ হিসেবে পালন করতেন। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ১লা জানুয়ারিকে নববর্ষের দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইংরেজি নববর্ষের মতো ইংরেজি মাসগুলোর নামকরণেও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। দেবতা জানুসের নাম অনুসারে

যেমন জানুয়ারি মাস, তেমনই লাতিন শব্দ ফেব্রুয়া থেকে এসেছে ফেব্রুয়ারি মাস। রোমানদের যুদ্ধের দেবতা মার্স। মার্স থেকেই মার্চের নামকরণ। গ্রিক দেবী আফ্রোদিতির নামানুসারে হয় এপ্রিল মাসের নাম রাখা হয়। রোমানদের দেবী মায়ার নাম অনুসারেই মে মাসের নামকরণ। দেবী জুনোর নামানুসারে রাখা হয় জুন মাসের নাম। সম্রাট জুলিয়াস সিজার জন্মগ্রহণ করেছিলেন জুলাই মাসে। তাই তাঁর নাম অনুসারেই মাসটির নামকরণ হয় জুলাই। সম্রাট অগাস্টাস সম্মানার্থে আগস্ট মাসের নামকরণ হয়। লাতিন শব্দ সেপ্টেমের অর্থ সপ্তম। লাতিন শব্দ অকটম থেকে এসেছে অক্টোবর কথাটি। আর নভেম থেকে এসেছে নভেম্বর। লাতিন শব্দ ডিসেম থেকে ডিসেম্বর মাসের উৎপত্তি।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি নববর্ষকে উৎসব পালন শুরু হয় উনিশ শতক থেকে। নববর্ষের আগের দিনটি ৩১শে ডিসেম্বর নিউ ইয়ার ইভ। সমগ্র বিশ্ব এই দিনটিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে আমরা নববর্ষের দিনটিকে উদযাপন করি, সেটি আসলে সৌর বছর। এই বর্ষপঞ্জিতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল কয়েকশো বছর। নানা পরিবর্তন পরিমার্জনের মধ্যে দিয়েই পেয়েছি আমাদের আধুনিক ক্যালেন্ডার। মানুষ প্রথম বর্ষ গণনা শুরু করে চাঁদের হিসাবে। ইতিহাস বলছে, রোমানরা তাদের প্রথম ক্যালেন্ডার লাভ করেছিল গ্রিকদের কাছ থেকে। তাদের সেই ১০ মাসের ক্যালেন্ডারে আরো দুটি মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে যুক্ত করেছিলেন রোমান সম্রাট নুমা ।

নানা সভ্যতা, নানা সংস্কৃতি কালের পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছে, উৎসব উদযাপনও পালটেছে। এখন ইংরেজি নববর্ষ সবার উৎসব। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সকলেই উন্মুখ হয়ে থাকে। ❑

প্রাবন্ধিক

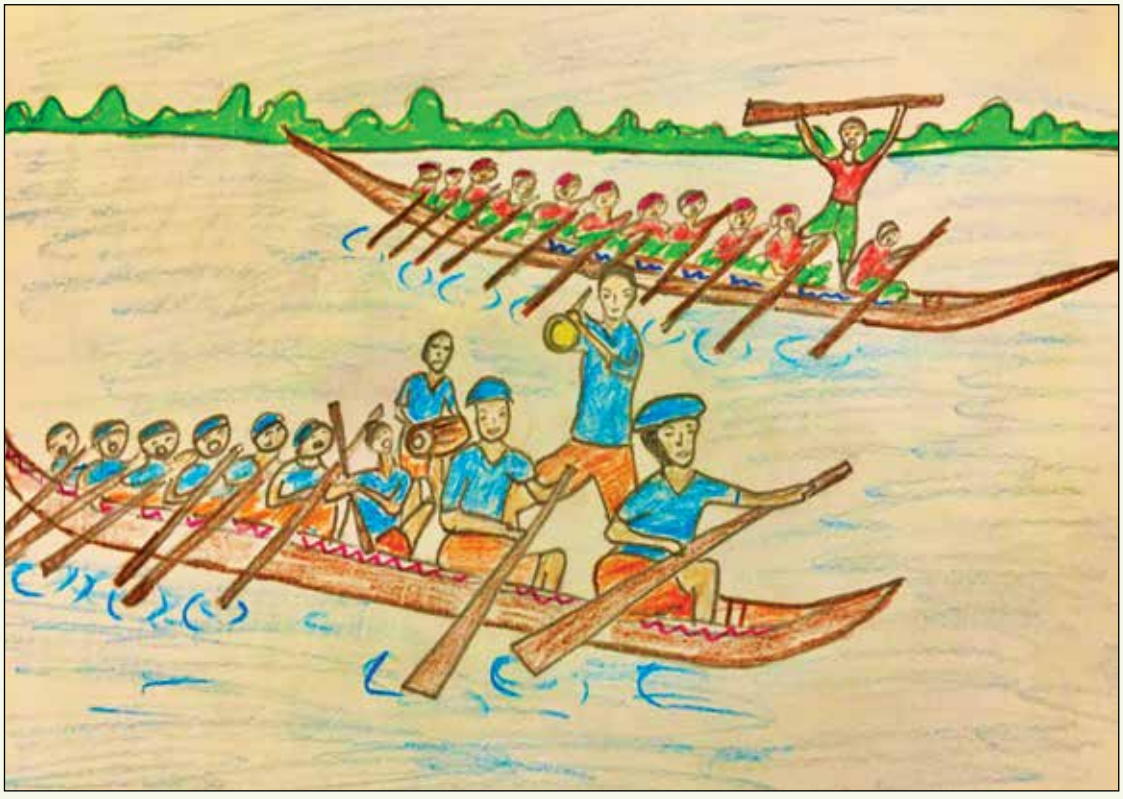

ইসরাক হাসান আদৃক, অষ্টম শ্রেণি, মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ঐতিহ্যের ঘুড়ি উৎসব

তৈয়ব হোসেন খান

ঘুড়ি উৎসব বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি উৎসব। মুঘল আমল থেকে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের কাছে এটি অত্যন্ত উৎসবমুখর দিন যা সাধারণত শীতকালে পালিত হয়।

বাংলাদেশে বিশেষ করে পুরনো ঢাকায় পৌষ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব পালন করা হয় যা অনেকের কাছে সাকরাইন উৎসব নামেও পরিচিত। বর্তমানে পুরান ঢাকায় সাকরাইন উৎসব (Shakrain Festival) সার্বজনীন ঢাকার উৎসবে রূপ নিয়েছে। সারাদিন ঘুড়ি উড়ানো, জমকালো আলোকসজ্জা, সন্ধ্যায় বর্নিল আতশবাজি ও ফানুসে ছেয়ে যায় পুরান ঢাকার আকাশ।

শুধু পুরান ঢাকা নয় বাংলাদেশ এবং কলকাতার অনেক অঞ্চলেই পৌষসংক্রান্তিতে বাঙালিরা সারাদিনব্যাপী ঘুড়ি উড়ায়। সেইদিন ঘুড়ি উড়ানোর জন্য আগে থেকে ঘুড়ি বানিয়ে এবং সুতায় মাঞ্জা দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ২৮০০ বছর পূর্বে চীন দেশে সর্বপ্রথম ঘুড়ির উৎপত্তি ঘটে। আর সেখান থেকে এটি এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন— বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, জাপান এবং কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রায় ১৬০০ বছর পূর্বে ইউরোপে ঘুড়ি খেলাটির প্রচলন ঘটে। প্রথমদিকে ঘুড়ি কাগজ বা হালকা তন্তুজাতীয় সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘুড়ি বানিয়ে উড়ানো হতো।

মূলত পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষের শীতের আমেজকে বাড়তি মাত্রা দিতে ঘুড়ি উড়ানোকে কেন্দ্র করে সাকরাইন উৎসব পালিত হয়।

সাকরাইন শব্দটি সংস্কৃত শব্দ সংক্রাণ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশেষ মুহূর্ত। অর্থাৎ বিশেষ মুহূর্তকে সামনে রেখে যে উৎসব পালিত হয় তাকেই বলা হয় সাকরাইন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন নামেই এ উৎসব পালন করে। বাংলায় দিনটি পৌষ সংক্রান্তি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে মকর সংক্রান্তি নামে পরিচিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৪০ সালের এই দিনে মোগল আমলে নায়েব-ই-নাজিম নওয়াজেশ মোহাম্মদ খানের আমলে ঘুড়ি উড়ানো হয়। সেই থেকে বর্তমানে

এটি একটি অন্যতম উৎসব ও আমেজে পরিণত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ না রেখে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করে পুরান ঢাকাইয়ারা।

ছোটো বড়ো সকলেই অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছাদ সুন্দর করে সাজানো হয় নানান ধরনের আলোকসজ্জায়। দুপুর হতেই শুরু হয় ঘুড়ি উড়ানো। আকাশে শোভা পায় নানা রং আর বাহারি আকৃতির ঘুড়ি। কে কার ঘুড়ির সুতা কাটতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। নানা কসরতে ঘুড়ির সুতা কেটে ফেলার আনন্দ আর চিৎকার ভেসে আসে চারদিক থেকে।

সাকরাইন উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে থাকে ঐতিহ্যবাহী মজার সব খাবারের আয়োজন। শীতের পিঠাপুলি, মুড়ি-গুড়, পায়েশ আরো কত কি!

সাকরাইনের ঘুড়ি বানানোতেও থাকে শৈল্পিক নিদর্শন। সঠিক মাপে ঘুড়ি তৈরি করতে না পারলে ঘুড়ি আকাশের নীল রং ধরতে পারবে না। এজন্য বাহারি রঙের ঘুড়ি তৈরি করা হয়। গোয়াদার, চোকদার, মাসদার, গরুদান, লেজলম্বা, চারভুয়াদার, পানদার, লেনঠনদার, গায়েল আরো কত্ত নামের ঘুড়ি উড়ে আকাশে।

বাহারি রঙের কাগজ, পলিব্যাগ ও বাঁশের অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি হয় এসব ঘুড়ি। সঙ্গে থাকে বাহারি রঙের নাটাই। আর নাটাই ও ঘুড়িতে সংযোগ দেওয়া বাহারি রঙের সুতা দিয়ে। সেসব সুতার মধ্যে রক সুতা, ডাবল ড্রাগন, কিংকোবরা, ক্লাক ডেবিল, ব্লাক গান, ডাবল গান, সম্রাট, ডাবল ব্লেট, মানজা, বর্ধমান, লালগান ও টাইগার অন্যতম।

বাহারি ঘুড়ির মালিককে নিয়ে আয়োজন করা হয় ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা। বাসার ছাদে এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীদের মাঝে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ নির্ধারণ করা হয়। ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতায় মূলত যে যত বেশি উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা দিয়ে অন্য ঘুড়ি কাটতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত যার ঘুড়ি নীলাকাশে উড়ে বেরাবে সেই চ্যাম্পিয়ন। ❑

আকাশটাকে ঘুড়ি করে

সোহাগ ফকির

আকাশটাকে ধরতে আমার
প্রজাপতির চাই ডানা,
রঙিন পাখা মেলব দূরে
শুনবো না হাওয়ার মানা।

হাওয়ার কাঁধে ভর করে ঐ
ইচ্ছে মতো উড়ে,
দৃষ্টি আমার কাটবে আঁচড়
সবুজ ফসল জুড়ে।

চন্দ্র সূর্য হতে কিছু
আনব রঙিন আলো,
ঝলমলিয়ে উঠব হেসে
লুকাবে সব কালো।

আকাশটাকে ঘুড়ি করে
আনব টেনে ঠিক,
নাটাই সুতায় বেঁধে দিয়ে
এইনা মাটির দিক।

ফুল পাখিদের দারুণ রঙে
স্বপ্নগুলো মেখে,
মনের মতো আকাশ খাতায়
যাব ছবি এঁকে।

মেঘের ডিজাইনে ঢাকার জার্সি

রনি হালদার

বিপিএলের দশম আসর। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই আসরের অন্যতম দল দুর্দান্ত ঢাকা তাদের নামের পাশাপাশি জার্সিতেও পরিবর্তন এনেছে। দলটির নতুন জার্সি ডিজাইন করেছেন প্রয়াত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির একমাত্র ছেলে মাহির সরওয়ার মেঘ।

১৭ই জানুয়ারি নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে দুর্দান্ত ঢাকা। অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগে তার ডিজাইন করা জার্সি পরে খেলেছিলেন দেশের ফুটবলে অন্যতম শীর্ষ ক্লাব শেখ জামাল ধানমন্ডির ফুটবলাররা।

২০২৪ বিপিএলে ঢাকার জার্সিতে বেশ ভিন্নতা আনা হয়। জার্সিতে প্রথমবারের মতো স্বপ্নের মেট্রো রেলকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জার্সিতে ছিল গাঢ় নেভি ব্লুসহ কিছু রঙের ভিন্ন ভিন্ন শেড। সঙ্গে সোনালি এবং নীল রংকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জার্সিতে ঢাকার বিভিন্ন স্মরণীয় এবং বিখ্যাত স্থাপনার চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। পেছনের অংশে আছে আহসান মঞ্জিল আর সংসদ ভবনের চিত্র। সেই সাথে রাখা হয়েছে নানা কারুকাজ। প্রথমবারের মতো বিপিএলে জার্সি ডিজাইন করতে পেরে আনন্দিত মেঘ। নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি লেখেন, 'একজন জার্সি ডিজাইনার হিসেবে এটাই আমার জীবনের সেরা অর্জন। সবাইকে ধন্যবাদ।' মেঘ আরো বলেন, 'আমি নিজেকে নিয়ে অনেক গর্বিত। এটা আমার জন্য অনেক বড়ো ব্যাপার। আমি অনেক ভাগ্যবান যে আমি কম বয়সে এত বড়ো মঞ্চে এত বড়ো একটি দলের সাথে কাজ করতে পেরেছি। এখন পর্যন্ত একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে এটা আমার জন্য সেরা অর্জন। সব ক্রিকেটাররা আমার জার্সি পছন্দ করেছে এটাই আমার সবচেয়ে বড়ো পাওয়া।

একটি ভিডিও বার্তায় জার্সির ডিজাইনার মেঘের বক্তব্যও প্রকাশ করেছে দুর্দান্ত ঢাকা। ভিডিওতে মেঘ বলেন, 'আসলে ঢাকা তো বাংলাদেশের রাজধানী। ঢাকাকে আমরা অনেক বড়োভাবে দেখি। আমি ঢাকায় থাকি। ঢাকায় অনেক বড়ো বড়ো জিনিস হয়েছে। যেমন মেট্রোরেল হয়েছে, অনেক স্মরণীয় জায়গা আছে যেমন স্মৃতিসৌধ রয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি ঢাকার যেসব বড়ো বড়ো জায়গা এগুলোর মধ্য থেকে একটি ডিজাইন করতে। হাতের মধ্যে এভাবেই নিজের মতো করে ডিজাইন করেছি। এসব মাথায় রেখেই আমি ডিজাইন করেছি।'

নিজের মনের মতো করে স্বপ্ন একেঁ চলেছেন মেঘ। 'ও' লেভেল শেষ করা মেঘের দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন এখন বড়ো ক্রিকেটার হয়ে দেশের জন্য লড়ে যাওয়া। বর্তমানে শেখ জামাল মাঠে নিয়মিত অনুশীলন করেন তিনি। ❑

বর্ণিল স্কুল

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলায় লাল-সবুজের রঙে সেজেছে ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। দৃষ্টিনন্দন বিদ্যালয়গুলো এখন হয়ে উঠেছে একেকটি লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই উপজেলার ১০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টি বিদ্যালয়ের ভবনকে জাতীয় পতাকার রঙে রাঙানো হয়েছে। বাকিগুলোর নতুন ভবন নির্মাণ শেষে একইভাবে রাঙানো হবে। কোমলমতি শিশুদের স্কুলগামী করা, স্কুল থেকে ঝরেপড়া রোধ করা , জাতীয় পতাকা ও সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সেজেছে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলো। শিল্পীদের রং তুলিতে আঁকা একেকটি স্কুল দেখলেই যেন মনে হয় একেকটি লাল-সবুজের বাংলাদেশ। কিছু বিদ্যালয়ের ভেতরের দেয়ালও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন চিত্রে সাজানো হয়েছে।

শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, শিশুদের নজর কাড়তে দেয়ালে আঁকা হয়েছে নানা ধরনের ছবি। জাতীয় পতাকা, বর্ণমালা, স্মৃতিসৌধ, শহিদ মিনার, ছয় ঋতুসহ নানা ধরনের চিত্রে বিদ্যালয়ের প্রতিটি দেয়াল যেন শিক্ষার এক একটি রঙিন ক্যানভাস। এমনকি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরেও আঁকা হয়েছে ফুল, ফল, পাখি, মিনা-রাজুর ছবিসহ শিক্ষামূলক সব চিত্র এবং মনীষীদের বাণী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর একেকটি নাম দেয়া হয়েছে। যেমন- অমর একুশে ভবন, বিজয় একাত্তর ভবন ও ৭ মার্চ ভবন । শিক্ষকদের মতে, এ কার্যক্রমের ফলে ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বাড়ছে,ঝরে পড়া কমেছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও মুগ্ধ করেছে রঙের ছোঁয়ায় রাঙানো বিদ্যালয়।

এখন আর কাউকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুঁজতে হয় না। লাল-সবুজ পতাকায় মোড়ানো ভবন মানেই এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এভাবে সাজানোর ফলে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে পড়া শিশুরাও সহজে জাতীয় পতাকার রং জানতে পারবে। লাল-সবুজ রঙের বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে শহিদদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে শিশুরা। ❑

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

যুব এশিয়া কাপ
চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। ১৭ই ডিসেম্বর দুবাইয়ে এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানের বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতল বাংলাদেশের যুবারা।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮২ রান তুলে বাংলাদেশ। ওপেনিংয়ে নেমে ব্যাটার শিবলির অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ১৪৯ বলে ১২৯ রান করেন ১২টি চার ও ১টি ছক্কায়। এছাড়া চৌধুরী মো. রিজওয়ান ৭১ বলে ৬০ ও ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালের নায়ক আরিফুল ইসলাম ৪০ বলে ৫০ রান করেন। অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বী শেষ দিকে ১১ বলে ২১ রান করে দলের সংগ্রহটা বড়ো করেন।

বাংলাদেশের দেওয়া ২৮২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের বোলারদের আগুনঝরা বোলিংয়ে আরব আমিরাত মাত্র ২৪.৫ ওভারে ৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৩ উইকেট করে পান বোলার মারুফ মৃধা ও রোহানাত দৌলা বর্ষণ, ২ উইকেট করে পান ইকবাল হোসেন ইমন ও শেখ পারভেজ জীবন। স্বাগতিক দলটি বাংলাদেশকে কোনো বিভাগেই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি।

ভারত, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে এবার শিরোপা এল বাংলাদেশে। দশবারের মধ্যে সর্বোচ্চ আটবার শিরোপা জিতেছে ভারত। আফগানিস্তান একবার ও পাকিস্তান একবার ভারতের সঙ্গে শিরোপা ভাগাভাগি করে।

যুব এশিয়া কাপের এবারের আসরে অংশ নেয় আটটি দল । আইসিসির পাঁচটি পূর্ণ সদস্য দেশ ছাড়াও অংশ নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল ও জাপান। আট দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলেছে। 'এ' গ্রুপে খেলেছে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপাল। 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলংকা ও জাপান। তিন ম্যাচেই জয় লাভ করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। শক্তিশালী ভারতকে সেমিফাইনালে হারিয়ে ফাইনালে উঠে বাংলাদেশ।

এবার যুব দলটি পেল এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব। এটি যুব ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় বড়ো অর্জন। এর আগে ২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। সেই দলটির প্রায় সবাই বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। ❑

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

নিপাহ ভাইরাসে সচেতনতা

নিপাহ ভাইরাস হলো বাদুড়ের মাধ্যমে সংক্রমিত একটি প্রাণীবাহিত ভাইরাস। সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এটি হেনিপা ভাইরাসের অন্তর্গত একটি আরএনএ ভাইরাস। সংক্রমিত বাদুড়ের লালা ও মূত্রে ভাইরাসটি পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময় এটি মানবদেহে অ্যানসেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ)-এর পাশাপাশি শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এবং শূকরের দেহে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটানোর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় শূকরের খামার থেকে মানবদেহে ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটে কিন্তু সংক্রমণটি তখন 'অজ্ঞাত রোগ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল। পরে ১৯৯৯ সালে ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। পোর্ট ডিক্সন, নেগেরি সেম্বিলানের 'সুঙ্গাই নিপাহ' (নিপাহ নদী) থেকে ভাইরাসটির নামকরণ করা হয়েছে, যেখানে প্রথম মানবদেহে ভাইরাসটি আবিষ্কৃত হয়। ইবোলা ভাইরাসের পাশাপাশি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে নিপাহ ভাইরাসটিকে ভবিষ্যৎ মহামারির সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০০১ সালে মেহেরপুর জেলায় নিপাহ ভাইরাসের রোগী পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নওগাঁ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে, ১১টি সংক্রমণের ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই শীতকালে কাঁচা খেজুরের রস পান করেন।

যারা ঝুঁকিতেঃ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী, আক্রান্ত শূকরের খামারি, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা সুস্থ ব্যক্তি, যারা শীতকালে কাঁচা খেজুরের রস পান করে, যারা বাদুড়ের আংশিক খাওয়া ফল খায়, যাতে বাদুড়ের লালা মিশ্রিত থাকে, যারা বাদুড়ের বাস করা কূয়ার পানি পান বা ব্যবহার করে।

রোগের স্থায়িত্ব ৪-১৪ দিন, তবে সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে। জ্বর, মাথাব্যথা, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, গায়ে ব্যথা, বমি, আচ্ছন্নতা, ঝিমুনি ভাব, সংজ্ঞাহীনতা, নিউমোনিয়া, অ্যানসেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ), কোমা।

প্রতিরোধঃ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, আক্রান্ত মানুষ, বাদুড় ও শূকরের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা, শীতকাল বা

অন্য যে-কোনো সময়ে কাঁচা খেজুরের রস পান না করা, হিমায়িত খেজুরের রস পান না করা, বাদুড়ের আংশিক খাওয়া বা কামড়ানো ফল না খাওয়া এবং বাদুড়ের বসবাসকৃত কূয়ার পানি ব্যবহার না করা।

নিপাহ ভাইরাসের সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী কোনো ওষুধ বা টিকা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনই সর্বোত্তম পন্থা। সুস্থ হওয়ার পরও রোগীদের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে; যেমন-স্মৃতিভ্রংশতা, কাজে অমনোযোগিতা, মৃগী রোগ, খিঁচুনি ও ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন।

আক্রান্ত রোগীদের ৪০-৭০ শতাংশ মৃত্যুবরণ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যা ১০০ শতাংশ। নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণের কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকায় এ ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও তা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৃত্যুঝুঁকি রোধের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ❑

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

স্মার্ট স্কুল বাস

সন্তান সঠিক ও সুস্থভাবে স্কুলে গেল কিনা এমন দুশ্চিন্তার শেষ নেই অভিভাবকদের। এসব দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চট্টগ্রাম নগরের সড়কে যাত্রা শুরু করল 'স্মার্ট স্কুল বাস'।

প্রাথমিকভাবে একটি বাসের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এসময় বাসে চট্টগ্রাম নগরের ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থী ছিল। তাদের প্রত্যেকেই স্মার্ট কার্ড চেপে বাসে ওঠে। সকালে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এটি সড়কে চলবে। চলতি বছরের জন্য বাসগুলোতে প্রতিজন শিক্ষার্থী ৫ টাকা মূল্যে যাতায়াত সুবিধা পাবে।

চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্মার্ট বাস প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। লাল রঙের এসব বাসে থ াকবে ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র। শিক্ষার্থীরা বাসে ওঠা বা নামার সময় এই হাজিরা যন্ত্রের সামনে স্মার্ট কার্ড চাপ দিলেই খুদে বার্তা পেয়ে যাবেন অভিভাবক। এছাড়া ঘরে বসেই জিপিএস ট্র্যাকিং ও সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বাস ও শিক্ষার্থীর অবস্থানও দেখতে পারবেন তারা।

নগরের ১০টি স্কুলবাসে জিপিএস ট্র্যাকার, জিআইএস প্রযুক্তি, ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইস ও আইপি ক্যামেরা স্থাপন করে এসব বাসকে 'স্মার্ট' করা হয়েছে। অক্টোবর মাসে স্মার্ট জেলা উদ্ভাবন চ্যালেঞ্জ-২০২৩ এর আওতায় প্রথম পুরস্কার পায় এই প্রকল্প।

এদিকে, ১০টি সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১০টি দোতলা বাস নগরের বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে। স্মার্ট স্কুল বাস চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসহনীয় যানজট, অভিভাবকদের ভোগান্তি, অধিক যাতায়াত খরচ, জ্বালানি অপচয়, সড়ক দুর্ঘটনা, অনিরাপদ স্কুল যাত্রাসহ অভিভাবকদের কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার মতো সমস্যার সমাধান করবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

জাদু দেখিয়ে বিশ্বরেকর্ড

কিশোরী অ্যাভেরি এমারসন ফিসার পানিতে ডুবে টানা ৩৮টি জাদু দেখিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে সম্প্রতি এ জাদু দেখিয়েছেন সে । পানির নিচে ৩৮টি জাদু দেখাতে তার সময় লেগেছে মাত্র তিন মিনিট।

অ্যাভেরির বাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে। এখন তার বয়স ১৩ বছর। জাদুর খেলায় হাত পাকানোর পাশাপাশি পানির নিচে সাঁতার কাটার কৌশল বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে সে। এই দুই গুণ একসঙ্গে কাজে লাগিয়েই এই রেকর্ড গড়েছে অ্যাভেরি ।

অ্যাভেরিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। তাতে দেখা যায়, ডুবুরির পোশাক পরে, মুখে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে একের পর এক জাদু দেখিয়ে যাচ্ছে অ্যাভেরি। ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন প্রায় আট হাজার মানুষ। আর এত কম বয়সে অ্যাভেরির এই অর্জনের প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর আগে ২০২০ সালে টানা ২০টি জাদু দেখিয়ে রেকর্ড করেছিলেন যুক্তরাজ্যের পেশাদার জাদুকর মার্টিন রিস। তবে তাঁর জাদু প্রদর্শনী পানির নিচে ছিল না। মার্টিনের সেই রেকর্ডই ভেঙেছে অ্যাভেরি। পানির নিচে জাদু দেখানোর এই পরিকল্পনা তার মাথায় আসে করোনা মহামারির সময়। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর।

এরপর পানির নিচে সাঁতার শেখা শুরু করে অ্যাভেরি। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি সনদও পেয়েছে সে। আর সাগরে ডুবুরির পোশাক পরে পানির নিচে সাঁতার কেটেছে ৩০ বারের বেশি। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

সাদিদ আল ইসলাম, তৃতীয় শ্রেণি, রামপুরা বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

যে দেশের নেই কোনো রাজধানী

প্রত্যেক দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই দেশের রাজধানী। কিন্তু বন্ধুরা তোমরা কি জানো পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যার নেই কোনো রাজধানী। দেশটির নাম নাউরু। ছোটো-বড়ো দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দ্বীপরাষ্ট্রও বলা হয়। দেশটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাইক্রোনেশিয়ায় অবস্থিত। এটি 'নোরু' নামেও পরিচিত। প্রায় ২১ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র এটি। ১৯০৭ সাল থেকে নাউরুতে ফসফেট খনন করা শুরু হয়। যা এখনও চলছে। অল্প জনসংখ্যা সত্ত্বেও এখানকার মানুষের মধ্যে দক্ষতার অভাব নেই। এই দেশটি কমনওয়েলথ এবং অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে আসছে। এই দেশের সরকারি মুদ্রা অস্ট্রেলিয়ান ডলার। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় নাউরুয়ান। ইতিহাসে রয়েছে, প্রায় ৩০০০ বছর আগে মাইক্রোনেশিয়ান ও পলিনেশিয়ানরা এই দেশে বসতি স্থাপন করেন। এদেশে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে তবে সংখ্যাটি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এই দেশের আয়ের প্রধান উৎস ফসফেট খনি। কথিত আছে, স্থানটি ঐতিহ্যগতভাবে ১২টি উপজাতি দ্বারা শাসিত ছিল। যার প্রভাব দেখা যায় এদেশের পতাকাতেও। ১৯৬০-৭০ সাল থেকেই এই দেশের আয়ের উৎস ফসফেট খনি। বর্তমানে এখানে প্রচুর পরিমাণে নারকেল উৎপন্ন হয়। নাউরুর সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর হলেও সেখানে পর্যটকের ভিড় বিশেষ হয় না। বিদেশিদের ভিড় কম বলেই এখানকার মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও সুখে জীবনযাপন করেন। ২০১৮ সালের আদমশুমারি অনুসারে, এখানকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১১ হাজারের কাছাকাছি।

১৪০ ভাষায় গান গেয়ে রেকর্ড

দুইটি কিংবা চারটি নয়। বিশ্বের ১৪০টি ভাষায় গান গেয়ে নতুন রেকর্ড করেছেন এক তরুণী। তিনি ভারতের কেরালা রাজ্যের বাসিন্দা। নাম সুচেতা সতীশ। কনসার্ট ফর ক্লাইমেটে ১৪০টি ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। তার এই গান গাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি। গত ২৪শে নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে কপ-২৮ সম্মেলন চলাকালে তিনি সেখানে কনসার্ট ফর ক্লাইমেটে অংশ নেন। জলবায়ু সচেতনতা নিয়ে কনসার্টে এই তাক-লাগানো কাজ করেছেন তিনি। দুবাইয়ে ভারতীয় কনস্যুলেটের অডিটরিয়ামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে ১৪০টি ভাষায় গান গেয়ে রেকর্ড করেছেন সুচেতা। গিনেস কর্তৃপক্ষ যাচাইয়ের পর তার সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৪০ সংখ্যাটি বেছে নেওয়ার কারণ সম্মেলনে ১৪০টি দেশ অংশ নিয়েছিল। মূলত দুবাইয়ে গত বছর জলবায়ু সম্মেলনে যেসব দেশ যোগ দিয়েছিল সেসব দেশের বিভিন্ন ভাষায় গান করে নতুন রেকর্ড করেন সুচেতা। এরই মধ্যে গিনেস বুক কর্তৃপক্ষ থেকে এই রেকর্ডের সনদ হাতে পেয়েছেন তিনি। স্বীকৃতি পাওয়ার পর সুচেতা তার ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে এটি শেয়ার করেন এবং সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানান।

মাছেদের দেশ

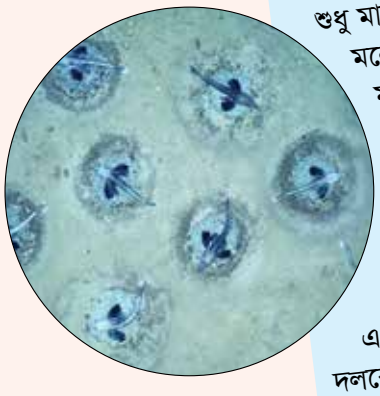

শুধু মানুষই নয় মাছেরাও বাঁধে বাড়িঘর। বিষয়টি শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। অ্যান্টার্কটিকায় সমুদ্রের তলদেশে মিলেছে মাছেদের তৈরি অসংখ্য বাসা। গবেষকরা জানান, সমুদ্রের তলায় থাকা এসকল বাসাগুলো আইস ফিশ বা বরফ মাছের তৈরি। অ্যান্টার্কটিকায় ওয়েডেল সাগরের তলদেশে এমন প্রায় ৬ কোটি বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি মাছেদের জগতের সবচেয়ে বড়ো প্রজননক্ষেত্র। আইস ফিশ বা বরফ মাছ একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী যার রক্তে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এ মাছের রক্তের রং সাদা। এরা ঠান্ডা এলাকায় বসবাস করে। এরা দলবেঁধে থাকতে পছন্দ করে এবং একসঙ্গে প্রায় ১৭০০ ডিম পাড়ে। সমুদ্রের তলদেশে থাকা বরফ মাছের বাসাগুলো দেখতে অনেকটা মাটির পাত্রের মতো। প্রতিটি বাসার মাঝে প্রায় ১৯ ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে। প্রায় ২৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বরফ মাছের এসব ঘর। আলফ্রেড ওয়াগনার ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে মাছেদের নিয়ে গবেষণা করে আসছে। সমুদ্রের তলদেশে বরফ মাছেদের সে স্থানের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। সমুদ্রের তলদেশে থাকা হেটো সামুদ্রিক জীব ও শৈবাল খেয়ে খাবারের চাহিদা পূরণ করে বয়স্ক মাছেরা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস কোন মাসে পালিত হয়, ৫. এক প্রকার ছোটো সুগন্ধি ফুল, ৬. চিকন, ৭. এক ধরনের পতঙ্গ, ৮. পারিবারিক, ১০. অন্যমনস্ক, ১১. ত্রিশ দিনে হয়

উপর-নিচ:
১. একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, ২.অভিনয়ের পূর্বে তালিম,৩. বিলোপ, ৪.একটি গ্রামীণ খেলা, ৭. বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ, ৯. আয়, ১০. মুখমণ্ডল

১.			২.	■	৩.	■	৪.
	■	■	৫.				
৬.		■		■		■	
	■	■		■	■	৭.	
৮.	৯.		■	■	■		■
■		■	১০.				■
■		■		■	■	১১.	
■		■		■	■		■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: গড্ডালিকা প্রবাহ, চাপালিশ, চাষাবাদ, অথবা, প্রকাশকাল, মামা, কাশবন, বহমান, বর, না

				গ				
			■	ড্ডা	■			
				লি		■		
	■		■	কা	■		■	
			■	প্র				
	■		■	বা	■		■	
		■		হ				
				■				

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৬৯			৫২			৩৯		৩৭
	৮১	৭২		৫৪	৪৯		৪১	
	৮০		৭৪	৫৫		৪৭		
		৭৬			৫৭	৪৬		
		৭৭		৫৯	৫৮		৪৪	
৬৪	৬৩		৬১	১৬			৩১	৩২
৭			১০		২০	১৯	৩০	
	৩			১৪		২৪		২৮
৫		১	১২		২২		২৬	

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	*		-	৩	=	
+	■	*	■	+	■	*
	*	৩	-		=	২
-	■	*	■	/	■	-
৪	-		+	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৩	-		=	৩

ডিসেম্বর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

লে	বা	ন	ন		বি	শা	ল
খ			ব	লা	কা		হ
ক	র		জা		ল	স্ক	র
	বি		ত	রু			
না	বা	ল	ক		চ	তু	র
	র				তু		
রা		দা	দা		র্ভু		কা
জা	পা	ন		সা	জ	গো	জ

ছক মিলাও

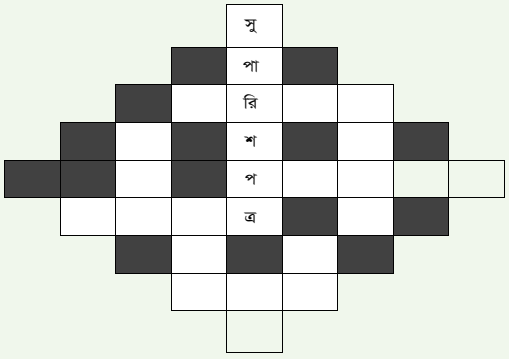

ব্রেইন ইকুয়েশন

৬	*	১	-	৪	=	২
+		*		+		*
৩	*	২	-	৫	=	১
-		+		-		+
৪	/	৪	+	৩	=	৪
=		=		=		=
৫	+	৬	*	৬	=	৬

নাম্ব্রিক্স

৬৭	৬৬	৬৫	৬২	৬১	৬০	২৭	২৬	২৫
৬৮	৬৯	৬৪	৬৩	৫৮	৫৯	২৮	২৯	২৪
৭১	৭০	৮১	৫৬	৫৭	৩৪	৩৩	৩০	২৩
৭২	৭৯	৮০	৫৫	৩৬	৩৫	৩২	৩১	২২
৭৩	৭৮	৭৭	৫৪	৩৭	১৮	১৯	২০	২১
৭৪	৭৫	৭৬	৫৩	৩৮	১৭	১২	১১	১০
৪৭	৪৮	৫১	৫২	৩৯	১৬	১৩	৮	৯
৪৬	৪৯	৫০	৪১	৪০	১৫	১৪	৭	৬
৪৫	৪৪	৪৩	৪২	১	২	৩	৪	৫

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

আগামীতে লেখক সম্মানী ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এজন্য সম্মানিত লেখকগণকে লেখার সাথে ব্যাংক একাউন্টের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা এবং রাউটিং নম্বর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব নম্বর চালু করার অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

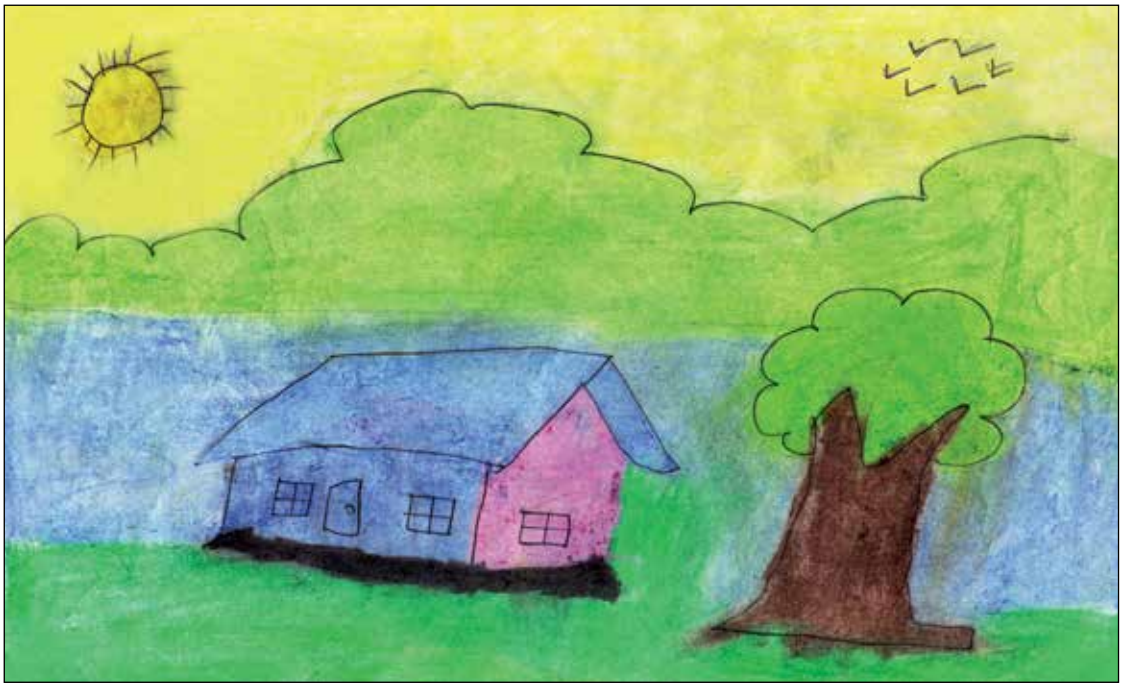

মোহাম্মদ ইয়াকুব বর্ণ, প্রথম শ্রেণি, প্রফেসর রওশন আহমেদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪

সানজিদা আক্তার রুপা, সপ্তম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

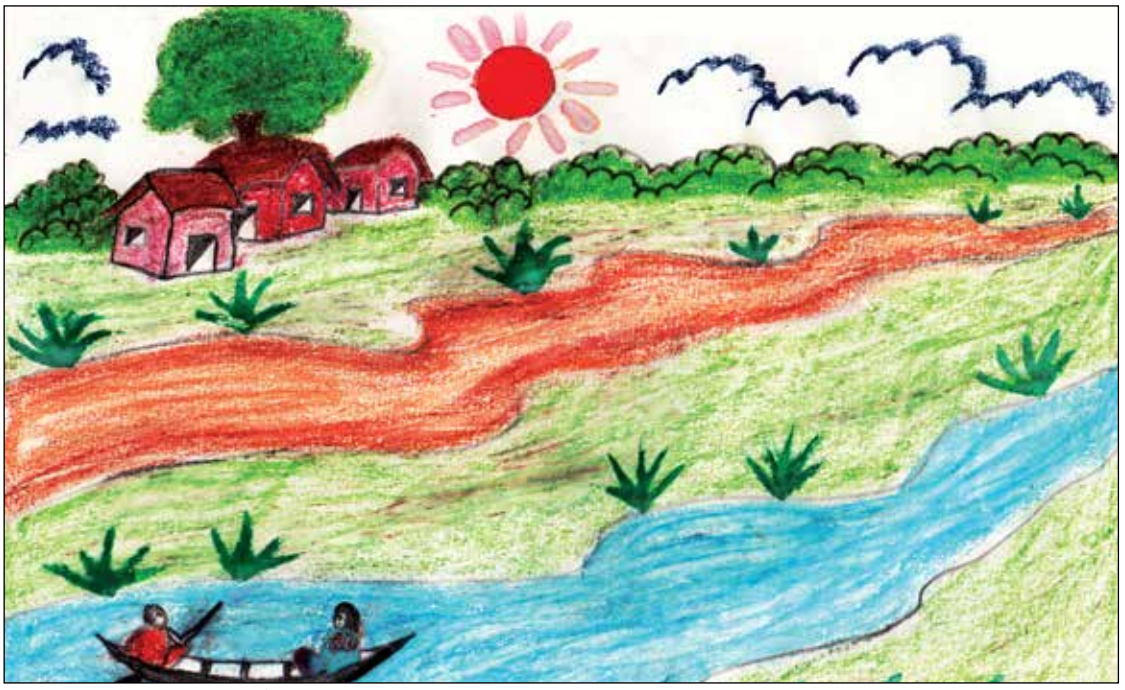

মৌমিতা আক্তার বন্যা, ষষ্ঠ শ্রেণি, কৈয়াকুড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, নকলা, শেরপুর

সামিহা হোসেন উম্মি, দ্বিতীয় শ্রেণি, মডেল একাডেমী মিরপুর-১, ঢাকা

নুশরাত জাহান নূর, তৃতীয় শ্রেণী, মার্চেন্ট ওয়ার্কার এমডব্লিউ উচ্চবিদ্যালয়, আদমজীনগর, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

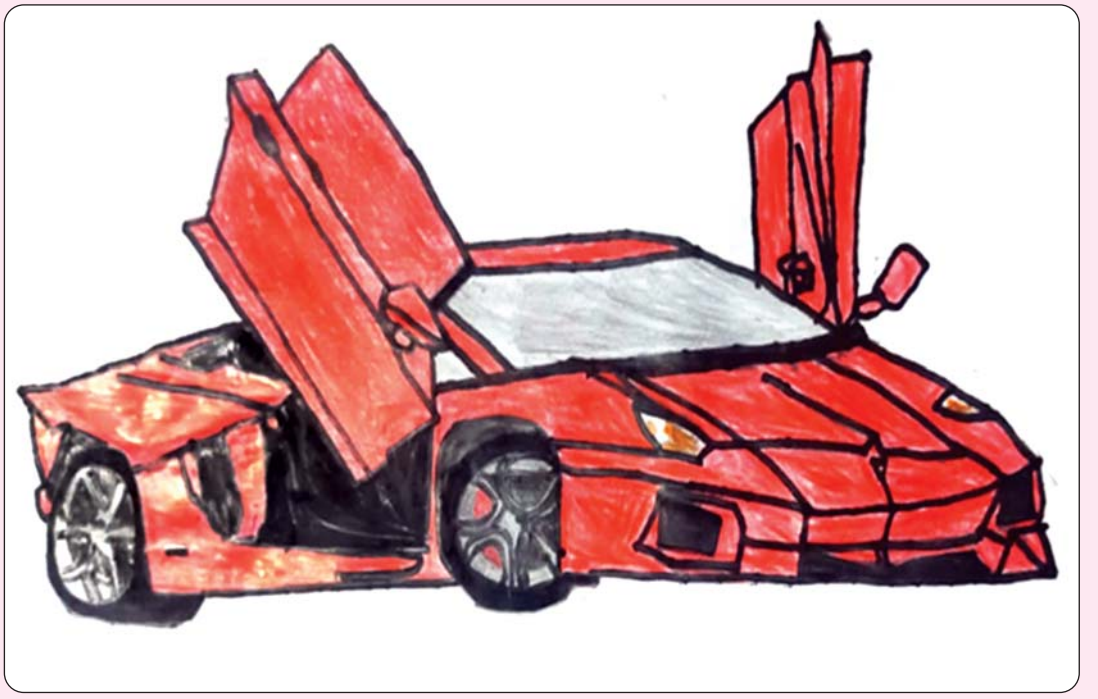

দ্বীন মোহাম্মদ, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-07. January 2024, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

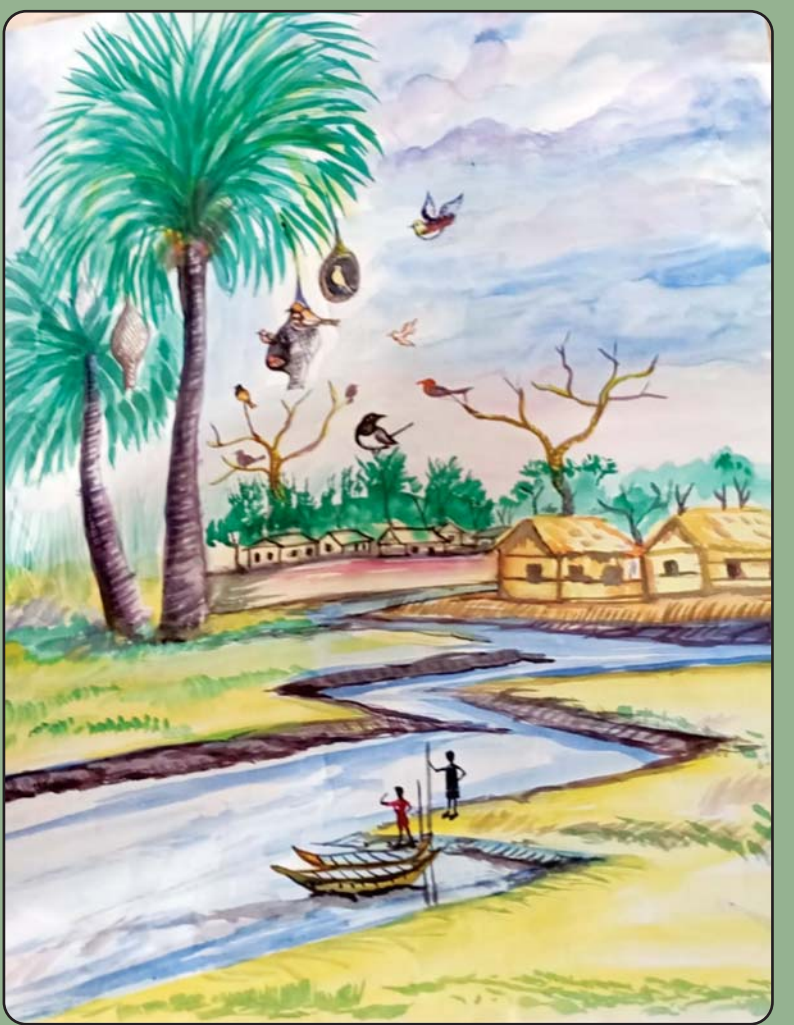

মারিয়া হায়দার দিতু, সপ্তম শ্রেণি, দারুস দাখিল মাদরাসা, পবা, রাজশাহী

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা